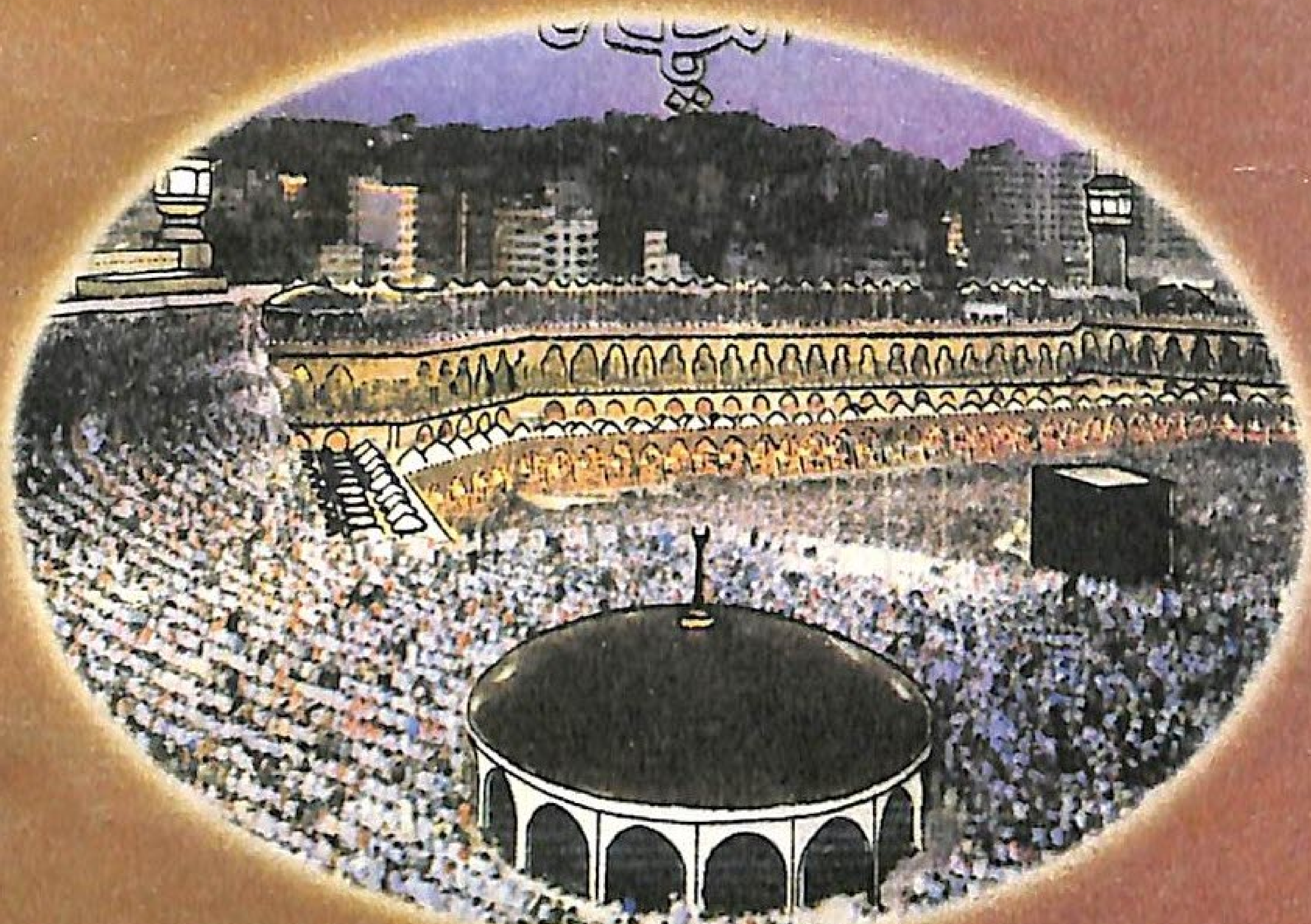
সভ্যতার আধুনিক যুগ

(অষ্টম শ্রেণী)



অধ্যাপক মোহাম্মদ রেফাতুল্লাহ্

Written according to the revised Syllabus by the West Bengal Board of Secondary Education as a text book of History for Class VIII Vide Board's Circular No. Syll/81/2 dt. 30.4.81 Modification Circular No. Syll/81/14 dt. 29.1.81
Board's Submission No.syll/H/VIII/81/154 dated 23/12/81

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

(সভ্যতার আধুনিক যুগ)

অষ্টম শ্রেণী

অধ্যাপক মোহাম্মদ রেফাতুল্লাহ ডব্লিউ. এস .ই. এস
এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ, পশ্চিমবঙ্গ
প্রাক্তন অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা
প্রাক্তন ভিজিটিং লেকচারার, রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা ; ভূতপূর্ব সদস্য, উর্দু একাডেমী, পশ্চিমবঙ্গ।
সদস্য, সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ

দীপ প্রকাশন ।। কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮১
সংশোধিত দীপ সংস্করণ ঃ — ২০০২

দাম ঃ ৩৫.০০

টাইপ সেটিং
আই. ই. আর. ই
২০৯এ বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ
অরুণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

শিক্ষা জগৎ নিয়তই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তালে তাল দিয়া স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাও নানাভাবে পরিবর্তিত হইতেছে। ভারতের জাতীয় সরকার জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। ফলে পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতি নানাদিকে নানা বৈপ্লবিক ও নূতন নূতন চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। পশ্চিমবাংলাতে উহার ঢেউ সমানভাবে অনুভূত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদও সেই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইতে দ্বিধা করে নাই। কাজেই নূতন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীসহকারে পাঠ্যপুস্তক ও পঠন পাঠন পদ্ধতির প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হইয়া দেখা দিয়াছে। বর্তমান পুস্তকখানি ঐ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয় বহন করিতেছে সন্দেহ নাই। নানাভাবে বইখানির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকে কিছু ভুলত্রুটি যে নাই তাহা বলা যায় না। সর্বোপরি, যাহাদের জন্য পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কিছু উপকার সাধিত হইলে পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পুস্তক প্রণয়নে আমি অনেকের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ঋণী। তাঁহাদের ঋণ আমি সর্বান্তঃকরণে স্মরণ করি। সর্বোপরি আমার সহধর্মিণী আসমাত-আরা-বেগম এ ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমার কন্যা মোসাম্মাত রাহাত সুলতানার কাছেও আমি সমানভাবে ঋণী। তাহা ছাড়া, দীপ প্রকাশনের কর্মীবৃন্দকে জানাই আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে পুস্তকখানি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

ইতি—

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯

বিনীত
মোহাম্মদ রেফাতুল্লাহ

সূচীপত্র

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা
সভ্যতার আধুনিক যুগ
অষ্টম শ্রেণী

১ম পর্ব মে-আগষ্ট মাস মোট কার্যদিবস ৭২ দিন	মোট পিরিয়ড-৩৩ সংশোধনী ও মূল্যায়ন ৫ পিরিঃ পঠন-পাঠন ....২৮ পিরিঃ	নানাবিধ কাজ......৬ দিন পড়াশোনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী.......৬৬ দিন

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
৭ম শ্রেণীর পাঠের ভিত্তিতে	পূর্বপাঠের সাধারণ আলোচনা	১	১	
(১) আধুনিক যুগ	ক) আধুনিক যুগের সংজ্ঞা খ) ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য	১		প্রতিটি একক পাঠের পর ৫ থেকে ১০ মিঃ তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করলে করলে ভালো হয়।
	গ) সামন্তযুগের অবসান ঘ) কৃষিতে উন্নতি	১	৩	
	ঙ) শিল্পে পরিবর্তন চ) প্রভাব	১		
(২) ইউরোপে নব জাগরণ	ক) রেনেসাঁর অর্থ খ) রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য গ) ইতালী ও ইউরোপে রেনেসাঁর প্রসার	২		পরিচিত চেনাজানা উদাহরণ, বিতর্ক কিংবা সহপাঠীদের আলোচনায় সাহায্য নেওয়া যাবে।
	ঘ) রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ ঙ) রেনেসাঁ যুগের মনীষী মানবতাবাদী, শিল্পী-বিজ্ঞান ও মুদ্রণ	৩	৫	
(৩) ইউরোপের বিস্তার	ক) কারণ খ) আবিষ্কারক গ) ফলাফল	২	২	মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ (১-২ একক)
(৪) ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন	ক) সংজ্ঞা খ) কারণ	১		মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ
	গ) ইংল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন ও স্কটল্যাণ্ডে আন্দোলন	২		
	ঘ) ক্যাথলিক চার্চে সংস্কার	১		
	ঙ) পবিত্র রোম সম্রাট— হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড	১	৫	

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
(৫) ১৭শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে বিপ্লব	ক) কারণ খ) গৃহযুদ্ধ গ) ক্রমওয়েল ঘ) রক্তপাতহীন বিপ্লব ও ফলাফল	২	২	
(৬) ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান	ক) বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান, আওরঙ্গজেব	২		
	খ) শাসনের বৈশিষ্ট্য গ) সাম্রাজ্যের পতন	১		
	ঘ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঙ) মারাঠাশক্তির উত্থান চ) শিখ শক্তির উত্থান	২	৫	মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ (৫-৬ একক)
(৭) ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার	ক) ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা খ) ওয়ারেন হেস্টিংস গ) লর্ড কর্ণওয়ালিস	২		
	ঘ) লর্ড ওয়েলেস্লী ঙ) লর্ড ময়রা চ) লর্ড ডালহৌসী (হায়দার আলী, টিপু সুলতান, ভোঁসলে, হোলকার)	২		
	ছ) ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ	১	৬	
	জ) বৃটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া	১		

২য় পর্ব
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

মোট পিরিয়ড-২৯
পঠন-পাঠন ....২৫ পিরিঃ
মূল্যায়ন-সংশোধনী- ৪ পিরিঃ

পরীক্ষার জন্য ১০ দিন
পড়াশোনা, মূল্যায়ন....
৫৮ দিন

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
(৮) ১৮শ শতাব্দী বিপ্লবের যুগ	ক) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১		
	খ) ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব	১		
	গ) ফরাসী বিপ্লব	২		
	ঘ) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঙ) বিপ্লবের ফলাফল	১	৫	মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ
(৯) ১৮১৫ সালের পর ইউরোপের ইতিহাস	ক) জাতীয়তাবাদ— গণতন্ত্র সংঘর্ষ— মেটারনিক	১		
	খ) জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১) ফ্রান্স ২) ইতালী	২		

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
	৩) জামানী	১		
	৪) উঃ আমেরিকা	১		
	৫) ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসার— সমাজতন্ত্র	১	৬	মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ
(১০) চীন ও জাপানের ইতিহাস	ক) চীনে বিদেশীদের আগমন, যুদ্ধ - সন্ধিসমূহ	১		
	খ) চীনে প্রতিক্রিয়া	১		
	গ) জাপানের অভ্যুদয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব-যুদ্ধ	২	৪	
(১১) বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ	ক) নতুন শাসনব্যবস্থা খ) উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন	৩		
	গ) জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘ) চরমপন্থী আন্দোলন	২	৫	১০-১১ একক নিয়ে মূল্যায়ন ও সংশোধনী
(১২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	ক) কারণ খ) শক্তিবর্গে দ্বন্দ্ব গ) যুদ্ধ ও ফলাফল	২	২	
(১৩) রাশিয়ায় বিপ্লব	ক) জার শাসন খ) বলশেভিক বিপ্লব গ) ফলাফল	৩	৩	১২-১৩ এককের উপর মূল্যায়ন ও সংশোধনী

৩য় পর্ব
জানুয়ারী- এপ্রিল
মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

মোট পিরিয়ড-২২
পঠন-পাঠন ....১৯ পিরিঃ
মূল্যায়ন-সংশোধনী- ৩ পিরিঃ

মাধ্যমিক পরীক্ষা— ১২ দিন
উচ্চ মাধ্যমিক— ১৫ দিন
বাৎসরিক পরীক্ষা— ১০ দিন
ও ফলাফল তৈরী
বাৎসরিক পরিকল্পনা— ১০ দিন
পঠন-পাঠন মূল্যায়ন— ৪৩ দিন

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
(১৪) ইউরোপের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)	ক) প্যারিস শান্তি সম্মেলন— চৌদ্দদফা নীতি	১		
	খ) ফ্যাসীবাদ ও মুসোলিনী	১	৪	
	গ) নাৎসীবাদ ও হিটলার	১		
	ঘ) জাতিসংঘ	১		

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
(১৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	ক) প্যারিস চুক্তি ও ভার্সাই সন্ধি খ) জাতিসংঘের ব্যর্থতা	১	৩	১৪-১৫ একক নিয়ে মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ
	গ) গোপন কূটনীতি ও যুদ্ধ ঘ) ফলাফল	২		
(১৬) স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় (১৯১৯-১৯৪৭)	ক) মহাত্মা গান্ধী খ) অসহযোগ আন্দোলন	১	৫	মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ
	গ) আইন অমান্য আন্দোলন ঘ) ভারত আইন	২		
	ঙ) ভারত-ছাড় আন্দোলন চ) নেতাজী ও আজাদ হিন্দ	২		
	ছ) গণ আন্দোলন জ) স্বাধীনতা লাভ	১		
(১৭) ক) চীনের ইতিহাস	ক) চীন প্রজাতন্ত্র খ) কুয়োমিণ্টাং গ) কুয়োমিণ্টাং—কম্যুনিস্ট সম্পর্ক	২		
	ঘ) মাও সে তুঙ-এর কর্তৃত্ব—লাভ	১		
খ) দঃ পূঃ এশিয়ায় বিপ্লব	ক) ইন্দোচীন খ) মালয়েশিয়া গ) ইন্দোনেশিয়া	১		
গ) পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ	ক) আটলাণ্টিক সনদ খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ	২		১৭-এককের উপর মূল্যায়ন ও সংশোধনী ১ পিরিঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধুরা স্কুল পরিবেশ অনুযায়ী পিরিয়ড সংখ্যা ঠিক করে নেবেন।

১

আধুনিক যুগ

তোমরা ইতিমধ্যে সভ্যতার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পড়েছ। মধ্যযুগের ইতিহাসের পর শুরু হয় ইতিহাসের আধুনিক যুগ। ঐতিহাসিকদের মতে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আধুনিক যুগ আরম্ভ। ইউরোপের অর্থনৈতিক যুগের সূত্রপাত করে।

ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন

ঐ পরিবর্তনে মধ্যযুগের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ঐ সময় গিল্ড ভিত্তিক সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। সুদ নেওয়া ও দরকষাকষি ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বুর্জোয়া ও পুঁজিপতিগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। টাকা দিয়ে তারা কাঁচামাল, শ্রমিক সরবরাহ এবং জিনিসপত্রের কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ভাড়াটে করা শ্রমিক ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। গড়ে ওঠে বড় বড় শিল্প। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আরও মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে বড় বড় কোম্পানী গড়ে ওঠে। দেশে ব্যাঙ্ক, সুদ ব্যবস্থা ও শেয়ার বিক্রয় দারুণ বৃদ্ধি পায়।

মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের অন্যতম ভিত্তি ছিল সামন্তপ্রথা। উহা সারা ইউরোপে শোষণের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ফলে কোন পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে উহার অবসান ঘটে। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহে সামন্তগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। শহর সৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা প্রসারের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সামন্তদের স্থান তারা অধিকার করে বসে। তাছাড়া, কৃষক ও সার্ফগণ মুক্ত জীবনের আশায় শহরে ভিড় করলে তাদের আর্থিক প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সামন্তদের ক্ষমতার উপর আঘাত হানে দেশীয় রাজগণ। তারা সামন্তদের হাতে পুতুলের মত ছিলেন। কিন্তু ধনী বণিক শ্রেণীর সাহায্যে তাঁরা সামন্তদের ক্ষমতা কেড়ে নেন। এভাবে ইউরোপ সামন্ত দাসত্ব থেকে রেহাই পায়।

সামন্ততন্ত্রের অবসান

শিল্প প্রসারের ফলে শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অধিক কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। ছোট ছোট খোলা মাঠের স্থানে ঘেরা বড় বড় কৃষি খামার সৃষ্টি হয়। শিল্পের মত কৃষিতেও আরও পুঁজি বিনিয়োগ হয়। উৎপাদনেও পরিবর্তন ঘটে। লোহার লাঙ্গল, বীজ ছড়াইবার যন্ত্র, ডাষ্টার স্প্রেয়ার, মাটি ভাঙ্গবার যন্ত্র, ট্র্যাক্টর, কমবাইন, কটনজিন প্রভৃতি বিভিন্ন নতুন যন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। সারি করে গাছ লাগানো, মাঝে মাঝে ফসলের পরিবর্তন, সার প্রয়োগ, উন্নত ষাঁড়, বলদ ও গাভী উৎপাদন, শক্তি ও পশুচালিত যন্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতি কৃষিকে লাভজনক করে তোলে। নানা নতুন শস্যের উৎপাদন হতে থাকে। ইউরোপে গম, বার্লি, টারনিপস, ক্লোভার ইত্যাদি ফসল উৎপাদন আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কৃষি উৎপাদনে উন্নতি

আধুনিক যুগে শিল্প উৎপাদনেও নানা পরিবর্তন হয়। শিল্পে যন্ত্র ও শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কয়লার সাহায্যে লোহা গলাইবার নতুন পদ্ধতি ও জলবিদ্যুতের ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজ করে। বয়ন শিল্পে ফ্লাইং সাটল, স্পিনিং জেনি, জলচালিত যন্ত্র ও মুসলিম হুইল অভাবনীয় পরিবর্তন আনে। বাষ্পচালিত ও শক্তিচালিত তাঁত ব্যবস্থা চালু হয়। নতুন নতুন ফসলের উৎপাদন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণে শিল্পকে সাহায্য করে।

শিল্পে পরিবর্তন

দেশে শিল্প ও কৃষিতে বড় বড় পুঁজিপতিদের সৃষ্টি হয়। তারা ছোট ছোট চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করে। ঐসব বাস্তু ও জমিহারা লোকজন শহরে ভিড় করে। নানা নোংরা বস্তি গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাণিজের ফলে বড় বড় শিল্পের সৃষ্টি হয়। ফলে প্রচুর উৎপাদন ও মুনাফা হয়। অন্যদিকে, শ্রমিক সমস্যা বাড়তে থাকে। এভাবে সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়। কৃষিতে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন হতে থাকে। তাঁত শিল্পে উৎপাদন আরও সূক্ষ্ম ও মসৃণ হয়। সামন্তপ্রথার অবসানে জমির উপর মানুষের অধিকার জোরদার হয়।

প্রভাব

বর্তমান যুগে আরও কতকগুলো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়ঃ (ক) মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির প্রয়োগ। (খ) ভৌগোলিক আবিষ্কার, ঔপনিবেশিক বিস্তার ও কলহ। (গ) জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাজ্য গঠন। (ঘ) ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রসার। (ঙ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার।

অনুশীলনী

দীর্ঘ/রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- সামন্ততন্ত্রের অবসানের কারণগুলি কি কি? (জ্ঞানমূলক)
- কৃষি শিল্পে নানান পরিবর্তন ঘটেছিল কেন? (বোধমূলক)

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

ক) ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিভাবে ঘটে? (বোধমূলক)
খ) সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ কি? (জ্ঞানমূলক)
গ) কৃষি ও শিল্পে কি উন্নতি ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১। আধুনিক যুগের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা চালু ছিল তা হোল (জ্ঞানমূলক)
ক) সামন্ত প্রথা। খ) গিল্ড ব্যবস্থা। গ) আন্তজার্তিক বাণিজ্য। ঘ) শেয়ার বিক্রয়।
২। শহর সৃষ্টির ফলে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় (জ্ঞানমূলক)
ক) ধর্মযাজকদের। খ) সামন্তদের। গ) বুর্জোয়াদের। ঘ) শ্রমিকদের।
৩। বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠার জন্য যে ফলাফল ছিল (বোধমূলক)
ক) সামন্তদের ক্ষমতাবৃদ্ধি। খ) ভৌগোলিক অধিকার। গ) ছোট ছোট চাষীর শ্রীবৃদ্ধি। ঘ) দাসত্ব প্রথার প্রসার।
৪। আধুনিক যুগের শুরু (জ্ঞানমূলক)
পঞ্চদশ/ষোড়শ/সপ্তদশ/উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।
৫। সামন্ত প্রথা লোপ হবার কারণ (জ্ঞানমূলক)
বণিক শ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধি/চার্চের ক্ষমতা হ্রাস/সার্ফদের সহযোগিতা/কৃষিতে বিপ্লব।
৬। জমির উপর মানুষের অধিকার বাড়ে (বোধমূলক)
শিল্পের উন্নতিতে/খামার তৈরীর জন্য/শ্রমিক সমস্যা বৃদ্ধি/সামন্ত প্রথার অবসান

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- আধুনিক যুগ কোন্ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল? (জ্ঞানমূলক)
- কিভাবে জমির ওপর কৃষকের অধিকার বাড়ে? (বোধমূলক)
- মধ্যযুগের শাসনের ভিত্তি কি ছিল? (জ্ঞানমূলক)
- আধুনিকযুগে শহরে কাদের ক্ষমতা বাড়ে?
- আন্তর্জাতিক শিল্পের ফলে কি ফল হয় (বোধমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- সামন্তপ্রথার ফলাফল কি হয়েছিল? (বোধমূলক)
- আধুনিক যুগে কৃষিক্ষেত্রে কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হোত? (জ্ঞানমূলক)
- সামন্তপ্রথার ফলাফল কি হয়েছিল? (বোধমূলক)
- আধুনিক যুগে কৃষিক্ষেত্রে কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হোত? (বোধমূলক)
- গিল্ড কি? (জ্ঞানমূলক)
- বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য কি কি? (বোধমূলক)

২

ইউরোপে নবজাগরণ

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে নানা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। জনসাধারণ সামন্তপ্রথার চেয়ে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে। চার্চ ও পোপের ক্ষমতা হ্রাস পায়। অন্ধ কুসংস্কারের পরিবর্তে লোকেরা সব কিছু পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে চায়। জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। এ সবের ফলে ইউরোপে নতুন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে রেনেসাঁস বলে।

রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ঃ রেনেসাঁস কথাটির অর্থ পুনর্জন্ম। রেনেসাঁস বলতে সাধারণভাবে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর সময়কে বোঝানো হয়ে থাকে। 'অন্ধকার যুগে' মানুষ সাময়িকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সূত্রপাত হয়। ১৪৫৩ সালে ঐ আন্দোলন আর দ্রুত হয়। ঐ সময় তুর্কী আক্রমণে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। ঐ শহর গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। উহার পতনে পণ্ডিতগণ ইতালী ও ইউরোপে নানা স্থানে আশ্রয় নেন। তাঁদের কাছে ছিল নানা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। ঐসবের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে নানা অজ্ঞাত দিক সম্বন্ধে ইউরোপ জ্ঞান লাভ করে ও রেনেসাঁস আরও পুষ্ট হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও রোমের আইন পঠন-পাঠন শুরু হয়। সর্বত্র এরিষ্টটল, সক্রেটিস, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও রোমের সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়রূপে গণ্য হয়। ইহাদের ভিত্তি ছিল যুক্তি ও অভিজ্ঞতা।

এছাড়া, ঐ সময় থেকে মানুষ চার্চ ও ধর্মের বাইরে জগৎ, জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চর্চা শুরু করে। তারা প্রচলিত ধর্ম ও চার্চ কর্তৃক যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিল না। এমনকি পৃথিবীকে ভুলে পরজগতের চিন্তাও তারা করে না। সবসময় এ পৃথিবীর সব কিছুকে তারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে শুরু করে। চার্চ ঐ সব

চিন্তা দমনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ভগবান এ জগতের সব কিছুর জন্য দায়ী এমন মনোভাব দূর হয়। অজ্ঞতা ও অযুক্তির স্থানে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

খ. ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রসার ঃ ইতালীতে সর্বপ্রথম রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নগর রাষ্ট্রে সামন্ত অর্থনীতির স্থানে দেখা দেয় বুর্জোয়া অর্থনীতি। সেখানে ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য থাকায় জাগতিক বিদ্যার চর্চা হোত। বোলোনা ও সালার্নো বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মের বাইরে নানা বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করে। নানা দেশের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে লোকেরা খুব উদার প্রকৃতির ছিল। সুতরাং কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির পণ্ডিতগণ ইতালিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তবে সেখানে রেনেসাঁসের প্রসার ঘটে প্রধানতঃ ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান প্রভৃতি নগর রাষ্ট্রে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শহরগুলি একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। প্রত্যেকে চাইত অপরের থেকে নিজের রাষ্ট্রকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল ফ্লোরেন্স। সেখানে সর্বপ্রথম রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়। বহু মনীষী যেমন দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাশিও, মাইকেল এঞ্জেলো, মেকিয়াভেলি, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ সরকারের অনুগ্রহ লাভ করেন। ফ্লোরেন্সের লাইব্রেরীতে আট হাজার পুস্তক সংরক্ষিত ছিল। ধীরে ধীরে নবজাগরণের ঢেউ মিলান, রোম ও অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। মিলানে লিওনার্দো ও কবি আরিআস্টো ছিলেন রেনেসাঁসের প্রধান ফসল। সেখানে রেনেসাঁস জোরদার হয় বিখ্যাত ভিস্‌কন্টি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁরা নিজেদের অমর করে রাখার জন্য শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি উন্নতির দিকে নজর দেন। একইভাবে রেনেসাঁস দেখা দেয় ভেনিস ও রোমে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভেনিস ছিল শিল্প, ভাস্কর্য ও শিক্ষা দীক্ষায় খুব অগ্রসর। রেনেসাঁসের প্রভাব সেখানে খুব জোরদার ছিল। রোমেও রেনেসাঁস ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পোপ শিক্ষা, শিল্প ও ইমারতে রোমকে নতুন করে সাজাতে চেষ্টা করেন।

ইতালীর প্রভাব সারা ইউরোপকে গ্রাস করে। আল্পস পর্বতের বাধা ডিঙ্গিয়ে রেনেসাঁসের ধাক্কা লাগে জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক জার্মানীতে রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করেন। হল্যাণ্ডে ইরাসমাস্, পর্তুগালে কবি কামোয়েনস্, স্পেনে লেখক সার্ভান্তিস এবং ফ্রান্সে রাবেলে, মঁতেস্কু প্রভৃতি রেনেসাঁস আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে

রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে। উহা পূর্ণতা লাভ করে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে। ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁস যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে চসার, শেক্সপীয়ার, ফ্রান্সিস ও রজার বেকন, এবং স্পেনসার প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এভাবে সারা ইউরোপ নতুন চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

রেনেসাঁস যুগে মানুষ হঠাৎ নিজের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। ইউরোপের সর্বত্র অসংখ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম হয়। বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মও ঐ যুগের এক অভাবনীয় ঘটনা। গ্রীক দার্শনিকগণ মানুষকে জানার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তার ফলে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়। নিজের সম্পর্কে ঐ জ্ঞানই তার মধ্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবোধ জাগিয়ে তোলে।

রেনেসাঁসে
মানবতাবাদ

রেনেসাঁসের যুগে মানুষের ঐ দাবি আদায়ের জন্যে ইউরোপে যে চিন্তাধারার শুরু হয় তাকে হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদ বলা হয়। মানবতাবাদী লেখকগণ তাঁদের রচনার মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি সম্পর্কে প্রচার করতে থাকেন। চার্চের শাসনের স্থানে মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন দেন। দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি এবং জগৎ ও জীবনের মূল্য সম্পর্কে নানা কথা তাঁরা দেশীয় ভাষায় প্রচার করেন।

মানবতাবাদী লেখকগণের মধ্যে ইতালির দান্তে, পেত্রার্ক, মেকিয়াভেলি ও বোকাশিও, ইংল্যাণ্ডের ফ্রান্সিস বেকন, চসার, স্পেনসার ও শেক্সপীয়ার, হল্যাণ্ডের ইরাসমাস্, স্পেনের সার্ভান্তিস ও ফ্রান্সের রাবেলে ছিলেন অন্যতম।

ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত কবি দান্তে ইতালি ভাষায় 'দি ডিভাইন কমেডি' কাব্য রচনা করেন। মানুষের প্রতি দরদ ও স্নেহ, ভাষা ও ছন্দের সৌন্দর্য তাঁকে সাহিত্য জগতে অমর করে রেখেছে। ইতালীর জীবজন্তু ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। তিনি পোপ ও চার্চের প্রচুর ধন সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, চার্চ ঐ কারণে ভালো কাজ করার অধিকার হারিয়েছে। তাঁর কল্পিত নরকে অনেক পোপও ছিল।

দান্তে
১২৬৫-১৩২১

পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) ঃ ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত কবি পেত্রার্ক দান্তের মত ল্যাটিন ও দেশীয় ভাষায় সুমধুর কাব্য রচনা করেন। তিনি ছিলেন রেনেসাঁস শিক্ষার জনক। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, পোপ ও পাদরীদের নৈতিক অধঃপতন ও বিলাসিতার নিন্দা করেন। তিনিই প্রথম মানুষের অধিকার ঘোষণা করেন।

মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) : বিখ্যাত বা কুখ্যাত মেকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্লোরেন্সের হৃত সম্মানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মাতৃভূমির রক্ষায় ন্যায় ও অন্যায় বলে কিছু নেই। উহার জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষায় যে কোন পথ উত্তম। তিনি বিখ্যাত 'প্রিন্স' গ্রন্থে শঠে শাঠ্যং নীতির বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, ধর্ম রাষ্ট্রের অধীন। রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা বস্তু।



পেত্রার্ক



মেকিয়াভেলি

বোকাশিও (১৩১৩-৭৫) : রেনেসাঁস যুগের অন্যতম লেখক ছিলেন বোকাশিও। 'ডেকামরণ' গ্রন্থে তিনি পাদরী ও চার্চের দুর্নীতিকে তুলে ধরেন। তাদের নীতিবোধ ও পবিত্রতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেন এবং মিথ্যাবাদী বলে তাদের বর্ণনা করেন। তাঁর ঐ গ্রন্থ ইতালীর গদ্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঐ গ্রন্থে জগৎ ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, দেশীয় ভাষার উন্নতি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডে মানবতাবাদী আন্দোলনকে জোরদার করে। চসার, ফ্রান্সিস বেকন ও শেক্সপীয়ারের রচনায় রেনেসাঁস যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ঐ সময়ের ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি ছিল জেওফ্রি চসারের (১৩৪০-১৪০০) 'কেন্টার বেরি টেলস্'। আর রেনেসাঁসের মহাকবি হলেন উইলিয়ম শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬)। তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের হতাশা, দুঃখ ও আবেগ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কু-প্রথার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনাও তিনি করেছেন।

স্পেনসারের রূপক কবিতা 'দি ফেয়ারী কুইন' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সিস বেকনও সে যুগের ধারণা লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন।

ইরাসমাস (১৪৬৭-১৫৩৬) ঃ হল্যাণ্ড রেনেসাঁস ও মানবতাবাদ প্রসারে তিনি ছিলেন প্রধান নায়ক। তিনি ছিলেন ধর্মে বিশ্বাসী। তবে ধর্মের গোঁড়ামি,



ইরাসমাস্



বোকাশিও

আচার-অনুষ্ঠান, কু-সংস্কার, মুক্তিপত্র প্রভৃতির তীব্রভাবে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। অলস ও দুশ্চরিত্র পাদরীদেরও তিনি ক্ষমা করেননি। অজ্ঞতা, মূর্খামি, পাপ ও হিংসার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর মানুষ। তিনি মনে করতেন, দেশীয় ভাষায় বাইবেল রচনা করলে সমস্ত স্তরের মানুষ ধর্মকে বুঝতে পারবে। তাঁর লেখা সে যুগে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সার্ভান্তিস (১৫৪৭-১৬১৬) ঃ রেনেসাঁস আমলে স্পেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন সার্ভান্তিস। তিনি 'ডন কুইক্সোটি' গ্রন্থে দুর্বল সামন্ত ও শিভালরি প্রথাকে ব্যঙ্গ করেছেন। ঐ গ্রন্থে সে যুগের জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

রাবেলে ঃ ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাবেলে। তাঁর লেখার মধ্যে জীবনের আশা ও আনন্দের ধারা লক্ষ্য করা যায়। জীবন তাঁর কাছে অসার ছিল না। তিনি পাদরীদের চারিত্রিক অধঃপতনের নিন্দা করেছেন। তিনি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। উহার ফলে সে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাবে এবং সৎভাব তার মধ্যে ফুটে উঠবে।

শিল্পে রেনেসাঁস ঃ রেনেসাঁস সে যুগের জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ঐ যুগে অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে এক নতুন যুগের শুরু হয়। সে যুগের শিল্পীরা চিরাচরিত ধর্মীয় শিল্পের পরিবর্তে মানুষ ও তার চারপাশের প্রকৃতির উপর আকৃষ্ট হন। দেবদেবী ও ধর্মকে তাঁরা বলিষ্ঠ মানুষ ও সুন্দরভাবে রূপ দেন।

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ঃ রেনেসাঁসের সবচেয়ে

প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি। তিনি কেবলমাত্র চিত্র শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি, দার্শনিক ও বিখ্যাত ভাস্কর। তাঁর বিখ্যাত ছবির মধ্যে 'মোনালিসা' ও 'শেষ ভোজ' আজও চিত্র জগতের গর্ব হয়ে আছে। তিনি মধ্যযুগের পাদরী ও কৃচ্ছ্রসাধনকে ঘৃণা করতেন। গ্রীক ও রোমক শিল্পের অনুকরণে তিনি প্রকৃত মানবিক চিত্র তুলে ধরেন।



লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি



মাইকেল এঞ্জেলো

রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) : রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শিল্পী ছিলেন রাফায়েল। তাঁর 'ম্যাডোনা' ও ভার্জিন চিত্র অমর শিল্পগুলোর অন্যতম।



রাফায়েল



গ্যালিলিও

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) : মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত ডেভিড ও 'মোজেসের' মর্মর মূর্তি কালজয়ী হয়ে

আছে। সিস্টাইন গির্জার চিত্র 'শেষ বিচার' জগতের এক বিরাট বিস্ময়। এছাড়া, তিনি ছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর ও স্থপতি। সেন্ট পিটার গীর্জার গম্বুজের নক্‌শা তিনি তৈরি করেন। তিনি যন্ত্র বিদ্যা ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন।

(গ) বিজ্ঞানে রেনেসাঁস ঃ রেনেসাঁসের আমলে মানুষ মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মেনে নিতে রাজী হোল না। তারা চার্চ ও ধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করে। চারপাশের জিনিসকে তারা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে পরীক্ষা করতে চায়। জগৎকে এভাবে বোঝাবার চেষ্টা থেকে শুরু হলো বিজ্ঞানের জয় যাত্রা। বিজ্ঞানের প্রসারে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রজার বেকন, ফ্রান্সিস বেকন, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি , কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও গুটেনবার্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রজার বেকন ঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে আবেলার্ড আলবার্ট ও টমাস একুইনাস বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অকস্‌ফোর্ডের অধ্যাপক রজার বেকন বিজ্ঞান ও উহার পদ্ধতির প্রয়োগের উপর জোর দেন। ধর্ম ও চার্চকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি বললেন, জ্ঞান লাভের দুটো পথ— (ক) যুক্তি ও (খ) পরীক্ষা। প্রথমটির মাধ্যমে সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টা যেহেতু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। তিনি আরও বলতেন, প্রকৃতিকে পরীক্ষা করলে মানুষ যন্ত্রচালিত জলজাহাজ ও গাড়ী আবিষ্কার করতে পারবে। তাঁর অপটিকস্‌, ভূগোল, মেকানিকস্‌, জ্যোর্তিবিদ্যা প্রভৃতির উপর প্রচুর আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে পরীক্ষা করতেন।

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক জার্মানীতে বিজ্ঞান প্রসারে চেষ্টা করেন। রজার বেকনও ফেডারিকের মতবাদকে আরও জোরালোভাবে ঘোষণা করেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন। তিনি বললেন বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন লেখকদের বিশ্বাস করা অত্যন্ত অন্যায়। পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস সত্য হয়। প্রতি কাজের পেছনে রয়েছে কারণ ও ফলাফল।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন

বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাঁর প্রচুর অবদান ছিল। মানবদেহের রক্ত চলাচল তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। মানুষের দেহ পরীক্ষা করে শারীরিক স্থান (anotomy) চিত্র অঙ্কনে তিনি সাহায্য করেন। আকাশে উড়বার যন্ত্রও তিনি তৈরি করেন। তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পাহাড় কাটার যন্ত্র, পোতাশ্রয় পরিষ্কার করার পদ্ধতি, মেশিনগান, জলের নীচে জলজাহাজ, আলোর প্রতিফলন প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেছেন।

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি

পোল্যাণ্ডের অধিবাসী বৈজ্ঞানিক **কোপার্নিকাস** সর্বপ্রথম মহাশূন্যে বিভিন্ন বস্তু কেমন করে চলাফেরা করে তার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সূর্য এই সৌরজগতের কেন্দ্র। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। উহার ফলে দিন রাত্রি হয়।

কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)

দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** (১৫৪০-১৬৪২) কোপার্নিকাসের সত্যকে প্রমাণ করে যান। তিনি আধুনিক বলবিদ্যার (Mechanic) জন্মদাতা। তিনি উপগ্রহ চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। দোলকের দোলনের নিয়মও তিনি বের করেন।

গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। জার্মানীর মেইনস্ শহরে জন গুটেনবার্গ সর্বপ্রথম ঐ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ধর্ম ও জ্ঞান বিজ্ঞান দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

গুটেনবার্গ

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কেন্দ্র ছিল (জ্ঞানমূলক)

ক) লণ্ডন।
খ) ইতালী।
গ) কনস্ট্যান্টিনোপল।
ঘ) স্পেন।

২। ইতালীতে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল (জ্ঞানমূলক)

ক) ফ্লোরেন্সে।
খ) হল্যাণ্ডে।
গ) জার্মানীতে।
ঘ) ইংল্যাণ্ডে।

৩। দি ডিভাইন কমেডি রচনা করেন (জ্ঞানমূলক)

ক) শেক্সপীয়ার।
খ) দান্তে।
গ) গুটেনবার্গ।
ঘ) গ্যালিলিও।

৪। তুর্কী আক্রমণের অন্যতম ফলাফল হোল (বোধমূলক)

ক) রেনেসাঁসের প্রসার।

খ) ইউরোপে কুসংস্কারের প্রসার।

গ) যুক্তির বদলে চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি।

ঘ) মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- রেনেসাঁস কথার অর্থ কি? (জ্ঞানমূলক)
- কোন রাজপরিবার ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁস প্রসারে সাহায্য করেন? (জ্ঞানমূলক)
- দেশীয় ভাষায় বাইবেল রচনার কি ফল হয়েছিল? (বোধমূলক)
- 'প্রিন্স' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (জ্ঞানমূলক)
- মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের তাৎপর্য কোথায়? (বোধমূলক)
- শেক্সপীয়র কোন্ দেশের লোক ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- রেনেসাঁস কি? (জ্ঞানমূলক)
- মানবতাবাদ কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)
- রেনেসাঁস যুগের নায়কদের নাম কি? (জ্ঞানমূলক)
- লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির অবদান কোথায়? (প্রয়োগমূলক)
- গ্যালিলিওর মূল বক্তব্য কি ছিল? (জ্ঞানমূলক)
- ইউরোপ রেনেসাঁস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার দুটি কারণ ব্যাখ্যা কর। (বোধমূলক)

রচনা/দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

- রেনেসাঁসের প্রধান ফলাফল কি হয়েছিল? (বোধমূলক)
- ইতালীতে রেনেসাঁসের সূত্রপাত কি ভাবে হয়? (বোধমূলক)
- রেনেসাঁস আন্দোলনে দান্তে ও পেত্রার্ক/ইরাসমাস ও সার্ভান্তিস/লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ও রাফায়েল/কোপার্নিকাস ও গ্যালেলিওর মূল অবদান লিখ। (বোধমূলক)
- রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (বোধমূলক)
- রেনেসাঁস আন্দোলন কিভাবে সমাজকে এগিয়ে দিয়েছে তার ৫/৬টি যুক্তি দেখাও। (প্রয়োগমূলক)

—

৩

ইউরোপের বিস্তার

রেনেসাঁস ইউরোপের লোকেদের মনে এনে দিয়েছিল অজানাকে জানবার ও শিখবার বিপুল উৎসাহ। উহার ফলে তারা লাভ করে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। মানবতাবাদী লেখকদের চেষ্টায় গ্রীক ও রোমের পণ্ডিতদের বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এরিস্টটল, টলেমি, প্লিনি, মার্কোপোলো প্রভৃতির বিবরণ নাবিকদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করে। উন্নত মানের কম্পাস তৈরি হয়। ভূগোলক ও মানচিত্র নির্মাণ, জোয়ার ভাটার সময় নির্ণয়, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জানাবার যন্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি সমুদ্র যাত্রা আরো সহজ করে তোলে। এছাড়া, প্রাচ্যের ধনসম্পদ লাভ, পরিবর্তিত অর্থনীতি ও তুর্কীদের প্রভাব থেকে মুক্ত বাণিজ্য পথ আবিষ্কারও ভৌগোলিক আবিষ্কারে সাহায্য করে।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উহার কারণ

জলপথ আবিষ্কারে কৃতিত্ব কয়েকজন সাহসী নাবিকের প্রাপ্য। এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পর্তুগাল ও স্পেনের রাজা ও রাণী।

জলপথের আবিষ্কার

জলপথ আবিষ্কারে পর্তুগালকে প্রথমে উৎসাহিত করেন **প্রিন্স হেনরী**। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সমুদ্রযাত্রার জন্যে তিনি মানচিত্র ও চার্ট তৈরির উন্নত ধরনের যন্ত্র নির্মাণ ও নাবিকদের ঐ সম্পর্কে জ্ঞানদান প্রভৃতি ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এ জন্য তাঁকে ইতিহাস **'নৌচালক হেনরী'** (Henry the Navigote) বলা হয়। তিনি সমুদ্রযাত্রার জন্যে স্কুল তৈরি ও পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, আটলান্টিক ও আফ্রিকা ঘুরে আবিসিনিয়া, মরক্কো, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে যাওয়া সম্ভব হবে। তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে পর্তুগালের নাবিকগণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করে কিছু দ্বীপ ও ভার্দে অন্তরীপ আবিষ্কার করেন।

প্রিন্স হেনরী
১৩৯৪-১৪৬০

তাঁর পথ অনুসরণ করে বার্থালোমিউ দিয়াজ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হন এবং ঝড়ের মুখে পড়েন। তিনি উহার নাম দেন

বার্থালেমিউ দিয়াজ

'ঝটিকা অন্তরীপ'। আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ ও সাম্রাজ্য প্রসারে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টাকে সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত করেন ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি চারখানা



ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উহার গতিপথ

জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঘুরে ঝটিকা অন্তরীপ পার হন। পরে ঐ অন্তরীপ 'উত্তমাশা অন্তরীপ' নামে পরিচিত হয়েছে। তিনি আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

ঘুরে আরব বণিকের সাহায্যে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভারতে এসে তিনি প্রচুর মাল-মশলা নিয়ে স্বদেশ ফিরে যান। এভাবে ভারত ও ইউরোপের বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হয়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক কেব্রাল সমুদ্রপথে ভারতের উদ্দেশ্যে বাহির হয়ে ঝড় ও স্রোতের টানে ব্রাজিলে হাজির হন। ফলে দঃ আমেরিকায় পর্তুগালের অধিকার বিস্তৃত হয়। তিনি কালিকটে বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ করেন।

ভাস্কো-ডা-গামা

কেব্রাল

স্পেনও ভৌগোলিক আবিষ্কারে পিছিয়ে ছিল না। সে দেশের রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলা নাবিকদের ভারতের জলপথ আবিষ্কারে উৎসাহ দেন। তাঁরা যাঁদের উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কলম্বাস, বালবোয়া, আমেরিগো ভেসপুচি ও ম্যাজেলানের নাম ছিল উল্লেখযোগ্য।

ইতালীর **কলম্বাস** বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী গোল। সুতরাং অনবরত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলে ভারতে পৌঁছানো যাবে। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ইতালী ও পর্তুগালে সাহায্যের আবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পেনের রাণী ইসাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানা জাহাজ নিয়ে পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন। ক্রমাগত দু'মাস যাবার পর তিনি আমেরিকার নিকটবর্তী বাহামা দ্বীপপুঞ্জে হাজির হন। তিনি মনে করেছিলেন ঐ দেশ ভারতবর্ষ। সেজন্য ঐ অঞ্চলের নাম 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ'। পরে তিনি কিউবা ও হাইতিও আবিষ্কার করেন। তিনি চীনে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৪৬-১৫০৬)

ভৌগোলিক আবিষ্কারে বালবোয়ার অবদানও ছিল প্রচুর। পরে ইতালীর নাবিক **আমেরিগো ভেসপুচি** আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে ঐ অঞ্চলের আবিষ্কর্তা বলে দাবী করেন। তাঁর নামানুসারে ঐ দেশের নাম হয় আমেরিকা।

আমেরিগো ভেসপুচি

কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন **ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান**। তিনি স্পেনের অধীনে চাকুরী করতেন। তিনি মনে করতেন, দঃ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা দিয়ে চলে মলাক্কা বা মশলা-দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সে উদ্দেশ্যে তিনি স্পেনের রাজা প্রথম চার্লসের নিকট সাহায্য চাইলেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচখানা জাহাজ ও ২৮০ জন নাবিক সঙ্গে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হন এবং দঃ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করেন ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। তারপর বহুকষ্টে বর্তমান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে তিনি হাজির হন। প্রশান্ত মহাসাগর খুব শান্ত ছিল বলে তিনি উহার ঐরূপ নাম দেন। স্পেনের রাজকুমার ফিলিপের নাম অনুসারে ঐ নতুন দ্বীপের তিনি নামকরণ

করেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তিনি সেখানে আদিবাসীদের হাতে নিহত হন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীগণ আফ্রিকা ঘুরে স্পেনে ফিরে আসেন।


কলম্বাস


ম্যাজেলান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল

(ক) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল তা পরিবর্তন হয়। তারা ঐ সব দেশে প্রাচীন সভ্যতার নানা দিক জানতে পারে ও তাদের মন আরও উদার হয়। (খ) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে সর্বপ্রথম পৃথিবী যে গোলাকার এ ধারণা সবার মনে বদ্ধমূল হয়। (গ) ভারত ও প্রাচ্যের জলপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের দেশসমূহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটে। সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য নিজেদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে এবং পরে তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ঐ অঞ্চলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ঐ সব উপনিবেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল, সোনা, রুপো প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু ও ধাতু ইউরোপে আসতে থাকে। ফলে ইউরোপ ঐ সব দেশকে শোষণ করতে থাকে। স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও মেক্সিকো অধিকার করে বিপুল সোনা, রুপো ও ধনরত্নের অধিকারী হয়। ইতিমধ্যে স্পেন পোপের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রাজিল বাদে উঃ ও দঃ আমেরিকার সমস্ত অঞ্চল লাভ করেছিল। পরে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের অধীন হলে ব্রাজিল, আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলসমূহ তার অধিকারে আসে। ফলে স্পেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সম্পদশালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

মধ্যযুগের শেষে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

আধিপত্য সমাজ ও রাষ্ট্রে বৃদ্ধি পায়। তাদের সমর্থনে সামন্তদের হাতের পুতুল-প্রায় রাজন্যবৃন্দ ধীরে ধীরে সামন্তদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে দুর্বল পোপ রাজার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নাই। তাছাড়া, জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য লোকেদের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। ফলে ইউরোপে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড ও পর্তুগাল শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১। ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল (বোধমূলক)
ক) কম্পাস তৈরীর জন্য।
খ) চার্চের উৎসাহের জন্য।
গ) ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতার জন্য।
ঘ) ভারতবর্ষ নিকটবর্তী হবার জন্য।

২। প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণ করেন (জ্ঞানমূলক)
ক) প্রিন্স হেনরী।
খ) আমেরিগো ভেসপুচি।
গ) ম্যাজেলান।
ঘ) কলম্বাস।

৩। ব্রাজিল আবিষ্কার করেন (জ্ঞানমূলক)
ক) রাণী ইসাবেলা।
খ) ভাস্কো-ডা-গামা।
গ) বি. দিয়াজ।
ঘ) কেব্রাল।

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের অন্যতম ফলাফল ছিল (বোধমূলক)
ক) পৃথিবী গোল তার প্রমাণ।
খ) আফ্রিকার ধনসম্পদ কলম্বাসের দ্বারা হরণ।
গ) পোপ ও চার্চের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
ঘ) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

৫। ভৌগোলিক আবিষ্কার না হলে (প্রয়োগমূলক)
ক) আন্তর্জাতিক ব্যবসা গড়ে উঠত।
খ) নানা দেশ সম্বন্ধে সহজে জানা যেত।
গ) 'উত্তমাশা অন্তরীপ' আবিষ্কৃত হোত।
ঘ) পৃথিবীতে ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপন ও শোষণ সম্ভব হোত না।

—

৪

ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন

মধ্যযুগে মানুষ অন্ধভাবে ধর্ম ও পোপের কর্তৃত্ব মেনে চলত। কিন্তু রেনেসাঁসের ফলে মানুষ চারপাশের সমস্ত কিছুকে স্বাধীন বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। তারা প্রচলিত ধর্ম, পোপ ও চার্চকেও সমালোচনা করতে শুরু করে। ফলে ধর্মক্ষেত্রে নানা আন্দোলন দেখা দেয়। সাধারণভাবে জার্মানীর মার্টিন লুথার পোপের বিরুদ্ধে যে ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাকেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বলা হয়। তবে মার্টিন লুথারের পূর্বেও ঐ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন

(ক) **কারণ** ঃ মধ্যযুগে মঠ ও চার্চে পাদরিগণ নিজ চরিত্র ও শিক্ষা দীক্ষার গুণে সমাজে এক উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কিছু কিছু পোপও ছিলেন আদর্শস্থানীয়। কিন্তু ধীরে ধীরে চার্চ ও পোপ নানা পাপে জড়িয়ে পড়েন। চার্চ প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়। পাদরীদের বিলাসিতার ফলে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। নানা দুর্নীতি তাদের মধ্যে দেখা যায়। একইভাবে পোপ নিজের বিলাসিতার জন্য জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় করতেন। দু'এক জন পোপের অবৈধ সন্তানও ছিল। জনসাধারণ ও রাজারা পোপের করভারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। নিজেদের অর্থ পোপের বিলাসিতা ও দুর্নীতির জন্য দেশের বাইরে চলে যাবে এটা তাঁরা চাইতেন না। ফলে রাজতন্ত্রের সঙ্গে পোপতন্ত্রের বিরোধ বাধে। পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ দেখা দেয় ইংল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী ও হল্যাণ্ডে।

ইংল্যাণ্ডে পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন **জন ওয়াইক্লিফ**। তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী ও সংগঠক। তিনি অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। নানা রচনার মাধ্যমে তিনি চার্চ ও পোপের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পত্তি না রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যীশুর যেখানে মাথা রাখবার জায়গা ছিল না সেখানে পোপের এত ভূসম্পত্তি ধর্মবিরোধী। চার্চ

এদিক থেকে পাপী প্রতিষ্ঠান ও উহার উপদেশ ও দীক্ষাদান আইনসম্মত নয়। মঠ ও চার্চ গরীবদের শোষণ করে বলে তারা চোর তুল্য। আসন নিয়ে কাড়াকড়ি ও ক্ষমতার নোংরামি পোপের মর্যাদাকে নষ্ট করেছে। ঐ ধরনের পোপদের ঐ পদে থাকা পাপ। রাষ্ট্রকে তিনি ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলেন। এতে অভিশাপের কোন ভয় নেই। তাছাড়া তিনি বলেন, মানুষের ভাগ্য ভগবান কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। ভগবানের আদেশ অনুসারে আমরা কাজ করি ও ভগবান সকলের প্রভু। সুতরাং মানুষের দীক্ষা বা মধ্যস্থতা নেবার কোন প্রয়োজন নেই। অনেকে তাঁকে রিফর্মেশন আন্দোলনের জনক বলে বর্ণনা করেন। ২৪টি প্রধান প্রধান যুক্তির সাহায্যে তিনি দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। লোলার্ড নামে তাঁর শিষ্যগণ ঐ আক্রমণ আরও জোরদার করেন। ওয়াইক্লিফ ও তাঁর শিষ্যরা ইংরেজী ভাষায় বাইবেল রচনা করেন এবং জনসাধারণকে ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলেন। ফলে চার্চ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করে। পরে কবর খুঁড়ে তাঁর অস্থিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জন ওয়াইক্লিফ
(১৩২০-১৩৮৪)

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচার করেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর **জন হাস**। তিনি জন ওয়াইক্লিফ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর প্রচার বোহেমিয়ায় পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তিনি ওয়াইক্লিফের মত শেষ ভোজনের তাৎপর্যকে অস্বীকার করেন। তিনি যীশুর মূর্তিপূজাও নানা আচার অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন। তিনিও পাদরীদের অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার ও তাদের নৈতিক অধঃপতনের আক্রমণ করেন। তিনি তৎকালীন পথভ্রষ্ট পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ধর্মসঙ্গত বলে বর্ণনা করেন। যীশু ও বাইবেল খ্রীষ্টানদের পথপ্রদর্শক, পোপ নন। তাঁর আমলে পোপের যুদ্ধ তহবিলে টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁর শিষ্য জেরোম উহার তীব্র প্রতিবাদ করলে পোপ ষষ্ঠ ক্রিমেন্টের নির্দেশে তাঁদের জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। হাসের মৃত্যু সংবাদে দেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। পোপ তাঁদের দমনে ব্যর্থ হন। তাঁরা দেশে বীর শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

জন হাস
(১৩৫৯-১৪১৫)

প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন **মার্টিন লুথার**। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্ট বক্তা। তাঁর অদম্য মনোবল, জার্মান জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা ঐ নতুন ধর্মকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। তিনি এক ধনীকৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ধর্ম ব্যাপারে লুথার জন ওয়াইক্লিফ ও হাসের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হাসের উপর ব্যবহার তাঁর মনে প্রশ্ন

তোলে "যে লোকটি ধর্মকে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁকে পুড়িয়ে মারা হোল কেন?" যাহোক তৎকালীন পোপ, পাদরী ও চার্চের অগাধ সম্পদ, ভোগবিলাস ও দুর্নীতির তিনি অভিযোগ করেন। তিনি নিজে রোমে গিয়ে পোপ ও চার্চের বিলাসিতা দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁর মতে জগতের সমস্ত অধঃপতনের জন্যে পাদরী ও চার্চ দায়ী। তারা মনগড়া উপদেশ দেয় এবং সাধারণ লোকেদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে। তিনি সবসময় মানুষের বিবেক, বিচার বুদ্ধি এবং বাইবেলকে পোপের উপরে স্থান দেন। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মুক্তি আসে যীশুর প্রতি ভক্তি ও ভালো কাজের মাধ্যমে, বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়। তিনি প্রথমে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত ধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ঠিক ঐসময় পোপ দশম লিও রোমের সেন্ট পিটার গির্জা নির্মাণে টাকা আদায়ের জন্য দেশে দেশে **মুক্তিপত্র** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বলা হয়েছিল, যে সকল পাপী ঐ মুক্তিপত্র ক্রয় করবে সে পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে। জার্মানীতে পোপ

মার্টিন লুথার
(১৪৮৩-১৫৪৬)



মার্টিন লুথার



টেট্জেলকে ঐ কাজে নিয়োগ করেন। লুথার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবাদ করেন এবং প্রথা অনুসারে ঐ প্রতিবাদপত্র উইটেনবার্গের গির্জার দ্বারে এঁটে দেন। ৯৫টি যুক্তির সাহায্যে তিনি ঐ মুক্তিপত্র বিক্রয় যে ধর্মবিরোধী তা বুঝিয়ে দিলেন। জার্মান ভাষায় উহা অনূদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তিনি আরও অসংখ্য পত্রিকায় পোপ ও চার্চের তীব্র সমালোচনা করেন। পোপ বাধ্য হয়ে তাঁকে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু লুথার উহাতে রাজী হলেন না। তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেল রচনা করেন।

তিনি জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পোপের প্রভুত্ব ধ্বংস করার আহ্বান জানান। অবশেষে নানা পরীক্ষার পর জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থনে জার্মানীতে লুথারের মতবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। যারা লুথারের শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের প্রটেস্ট্যান্ট বলা হয় এবং লুথারের মতকে প্রটেস্ট্যান্টিজম্ বলা হয়।

খ. ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রসার ও ফলাফল :

লুথারের আদর্শ "পোপের হাত থেকে জার্মানীকে রক্ষা কর" জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়। বহু জার্মান অভিজাত ও টিউটন নাইটগণ ঐ সুযোগে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও চার্চের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ফলে জাতীয় পতাকার নীচে সংস্কার আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। পোপ লুথারকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করেন এবং জার্মানীর শাসকদের তাঁর শাস্তিদানের ব্যবস্থা নিতে বলেন। পোপের আদেশনামা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তেমন কিছু ফল হয় নাই। অনেকেই লুথারকে জার্মানীর **পরিত্রাণদাতা** বলে ঘোষণা করেন ও বিভিন্ন রাজ্য তাঁর মত গ্রহণ করে। একমাত্র উত্তরের স্যাক্সনি, ব্রাডেনবার্গ, দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানীর কিছু ক্যাথলিক রাজ্য ছাড়া সমস্ত জার্মানীতে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে লুথারের মতবাদ উত্তর ইউরোপের ডেনমার্ক, সুইডেন ও আইসল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। ডেনমার্কের রাজা ও জনসাধারণ পোপ ও চার্চের

ডেনমার্ক

প্রভাব ও অত্যাচার সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। চার্চের অধঃপতনে দেশে সমালোচনা শুরু হয়। মুক্তিপত্র বিক্রয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ডেন ভাষায় বাইবেল রচিত হয়। নানা গণ্ডগোলের পর ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট লুথারের মতবাদকে মেনে নেয়।

সুইডেনের নেতা গুস্তাভাস দেশ গঠনের কাজে চার্চের নিকট অর্থ চাইলে উহা তীব্র প্রতিবাদ করে। ফলে তিনি লুথারের আদর্শে চার্চের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

সুইডেন

করেন। ইতিমধ্যে দেশে ঐ মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাজা পোপের আদেশ অমান্য করে নিজ প্রার্থীকে প্রধান বিশপের পদে নিয়োগ করেন। সুইডিশ ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়। ১৫২৭ সালে এক আইন জারী করে লুথারের ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। চার্চও রাজার অধীনতা স্বীকার করে।

ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও দেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচলিত ছিল। সেখানে ঐ আন্দোলন শুরু হয় অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে।

টিউডর বংশের রাজা হেনরী দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রথমে ক্যাথলিক ধর্মের ভক্ত ছিলেন এবং পোপের কাছ থেকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বৈবাহিক জীবনকে কেন্দ্র করে অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। স্পেনের রাজকন্যা ও পবিত্র রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মাসি ক্যাথেরিণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁর কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় রাজা ঐ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চান এবং পোপ ও চার্চের অনুমতি চান। চার্লসের ভয়ে পোপ ও চার্চ ঐ মত অনুমোদন না করলে রাজার সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। তিনি দেশের কোর্টের সাহায্যে ঐ বিবাহ বিচ্ছেদ করেন এবং ১৫৩৪ সালে পার্লামেন্টের এক আইন দ্বারা ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দেশে ইংল্যান্ড চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা চার্চের প্রধান বলে ঘোষিত হন ও উহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও কন্যা রাণী এলিজাবেথের আমলে ঐ আন্দোলন সমাপ্ত হয়। ইংল্যাণ্ডে প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়।

ইংল্যান্ড

স্কটল্যাণ্ডে ও লুথার ও ওয়াইক্লিফের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। অনান্য দেশের মত সেখানে চার্চের অধঃপতন ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দেয়। রাজারা পাদরীদের বশে রাখার চেষ্টা করেন। এদিকে ওয়াইক্লিফের বাইবেলের অনুবাদ করা হয় ও লুথারের নানা রচনা দেশে প্রবেশ করে। বহু প্রটেস্ট্যাণ্টদের হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যে জন ক্যালভিনের আদর্শে **জন নক্স্** ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে নতুন শক্তিদান করেন। তাঁর সঙ্গে ক্যাথলিকদের যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে প্রটেস্ট্যাণ্টগণ ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে জয়ী হন। পার্লামেণ্ট নতুন ধর্মকে মেনে নেয় ও পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

স্কটল্যান্ড

গ. ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ

প্রটেস্ট্যাণ্টদের আক্রমণের হাত থেকে ধর্মকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। নানা ভাবে ধর্মকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলতে থাকে। ইটালী, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সে ঐ আন্দোলন জোরদার হয়। তৃতীয় পোপ পল ঐ ব্যাপারে আরও আগ্রহী হন। তিনি চার্চে সৎ, বিদ্বান ও ন্যায়বান পাদরীদের নিয়োগ করতে থাকেন। অন্যদিকে, তিনি চার্চের অবস্থা বিচার করার জন্য কমিটিও নিয়োগ করেন। পাদরীদের নতুন করে কৃচ্ছ্রসাধন, মানুষের সেবা ও নৈতিক চরিত্রের উপর জোর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বিধর্মী আন্দোলন যাতে দেশকে বিপথে না নিয়ে যায় তার জন্য বিধর্মীদের দমনের চেষ্টা করা হয়। তাদেরকে ধর্ম, চার্চ ও সমাজের শত্রু বলে মনে করা হোত। এছাড়া তাদের বিচারের জন্যে পোপ এক বিশেষ ধরনের ধর্মীয়

আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। উহাকে বলা হোত **ইনকুইজিশন্ কোর্ট** বা ধর্মদ্রোহীদের বিচার আদালত। ধর্মীয় ব্যক্তিগণ ধর্মদ্রোহীদের বিনা বিচারে আটক ও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত। গোপনে একতরফা ভাবে তাদের বিচার হোত। তাদের উপর নানা অকথ্য অত্যাচারও করা হোত। ইটালী ও স্পেন ঐ কোর্টের এত প্রভাব ছিল যে, ঐ দুই দেশে লুথারপন্থীদের চিহ্ন ছিল না।

ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কারে প্রধান ভূমিকা ছিল ঐ সমিতির। উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্পেন দেশের **ইগনেশিয়াস লয়োলা** দামে একজন সামরিক কর্মচারী। ১৫৩৪ সালে প্যারিসে ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্ম-সম্পর্কে পাদরীদের অজ্ঞতাই চার্চের অধঃপতনের প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করতেন। সেজন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। ঐ সমিতির প্রায় সকলেই ছিলেন সৎ, ধার্মিক ও পণ্ডিত। নানা রাজ্যে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং দেশে দেশে ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার করেন। পোপ তাদের ধর্মব্যাপারে কাজ করার অনুমতি দান করেন। ফলে প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের স্রোত কিছুটা বন্ধ হয়। পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরীতে পুরাতন ধর্ম টিকে থাকে। এছাড়া, ঐ ধর্ম প্রচারে তাঁরা এশিয়া, আমেরিকা ও অন্যত্র সাফল্যলাভ করেছিলেন।

যীশুর সমিতি বা জেনুইট সমিতি

ধর্মরক্ষায় পোপ পল জার্মানী ও ইটালির মধ্যবর্তী **ট্রেনট্** নামক স্থানে একটি ধর্মসভার আহ্বান করেন (১৫৪৫-১৫৬৩)। ঐ সভা প্রায় বিশ বছর ধরে চলে। ইটালি ও স্পেন থেকে পোপের মনোনীত পাদরিগণ সেখানে যোগদান করেন। ঐ সভায় ক্যাথলিক ধর্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (ক) বহুকাল আগে যে সব আইন কানুন চলে আসছিল সেগুলোকে স্বীকার করা হয় ও তাঁর কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। (খ) পোপের ক্ষমতা আরও মজবুত হয়। (গ) ধর্মের নামে টাকা আদায় বন্ধ ও পাদরীদের ধর্ম, বিশ্বাস ও কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। (ঘ) বাইবেলের সংস্কার করা হয়। (ঙ) বিধর্মীদের পুস্তকের একটা নির্ঘণ্ট তৈরি করা হয়। ক্যাথলিকদের পক্ষে ও ক্যাথলিক দেশে উহাদের পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়।

ট্রেনটের ধর্মসভা (১৫৪৫-১৫৬৩)

প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্মকে কেন্দ্র করে জার্মানী দুই যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়। একদিকে প্রটেস্ট্যাণ্টদের লীগ গঠিত হয়। দু'পক্ষই তাদের ধর্মকে রক্ষার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস জার্মানদের ঐক্যকে ভালো চোখে দেখেন নাই। তিনি জার্মানীতে নতুন ধর্ম ধ্বংস করে সারা ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু পূর্বদিকে তুরস্ক ও পশ্চিমে ফ্রান্সের

পঞ্চম চার্লস প্রটেস্ট্যাণ্ট

সঙ্গে যুদ্ধের ফলে তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে তেমন কিছু করতে পারেন নাই। ফলে তাঁকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে আপস করতে হয়। অবশেষে সম্রাট বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেলে লুথার পন্থীদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। পোপও তাকে এবিষয়ে যথেষ্ট সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ফলে চার্লস ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে চার্লস সব যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। চার্লস পরাজিত হয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ফ্রান্স ঐ যুদ্ধে জার্মানীদের সাহায্য করে।

অগস্‌বার্গের চুক্তি (১৫৫৫)

অবশেষে দু'পক্ষে অগস্‌বার্গে চূড়ান্ত সন্ধি হয়। উহা দ্বারা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। জার্মানরা নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করার অধিকার পায়। ঠিক হয়, রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের ধর্মমত ঠিক করবেন। লুথার সমর্থক রাজ্যগুলিতে ক্যাথলিক ধর্ম নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে জার্মানীতে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে।



পঞ্চম চার্লস



দ্বিতীয় ফিলিপ

স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের যুদ্ধ

(ঘ) পিতা চার্লসের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্যে তিনি অপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে একতা এনে সারা ইউরোপে নিজ প্রভুত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এজন্য ক্যাথলিক বিরোধী আন্দোলন দমনে তিনি প্রধান ভূমিকা নেন। এ প্রসঙ্গে স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ অঞ্চল স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। জার্মানীর খুব কাছাকাছি থাকার ফলে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের ঢেউ ঐ দেশে ধাক্কা মারে। হল্যাণ্ডে

ইরাসমাস্ চার্চ ও পোপের অনাচারের তীব্র সমালোচনা করেন। ফলে দেশের উত্তরাংশে চার্চ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। সম্রাট পঞ্চম চার্লস ঐ আন্দোলন দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু তিনি যেহেতু ঐ দেশে লালিত পালিত হয়েছিলেন, সেহেতু লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। কিন্তু তাঁর পুত্র **ফিলিপ** স্পেন দেশে লালিত-পালিত। সুতরাং তাঁর শাসনকে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বিদেশীর শাসন ও অত্যাচার বলে মনে করত। ফলে যখন সেনাপতি আলভা যখন তাদের উপর নানা অন্যায় কর বসান ও অত্যাচার করতে শুরু করেন এবং ফিলিপ একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তখন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। উত্তরাংশের সাতটি প্রদেশে ১৫৭৯ সালে **ইউট্রেকট্**-এর চুক্তি অনুসারে নিজেদের ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়। জল ও স্থলে সংঘর্ষ বাধে। এগমণ্ট ও অরেঞ্জের উইলিয়ামের নেতৃত্বে শত্রুদের তাঁরা পরাজিত করেন। এদিকে ইংল্যাণ্ড সবরকমভাবে স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডকে সাহায্য দিতে থাকে। ফলে ফিলিপ তেমন কিছু করতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তিনি এখন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। স্পেনের রণতরী (আর্মাডা) ইংল্যাণ্ডের নিকট পরাজিত হলে ডাচদের বিরুদ্ধে ফিলিপ কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই। অবশেষে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন নেদারল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। অন্যদিকে, দক্ষিণের দশটি প্রদেশ ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের নিয়ে পরবর্তীকালে বেলজিয়াম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। উহা প্রায় দু'শ বছর অস্ট্রিয়ার অধীন ছিল।

ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ড

অরেঞ্জের উইলিয়াম

(ঙ) **ইংল্যাণ্ড ও স্পেনে সংঘর্ষ** ঃ ফিলিপ যখন স্পেনের সম্রাট, তখন মেরী ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাণী। তিনি ছিলেন সম্রাট ফিলিপের সহধর্মিণী। দুজনেই ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। দুজনেই চেয়েছিলেন প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের ধ্বংস করে সারা ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ফিলিপের উৎসাহে মেরী সিংহাসনে আরোহণ করেই লুথারপন্থীদের খতম করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মেরী হঠাৎ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ফিলিপের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রাণী হন। তিনি জন্ম থেকেই ক্যাথলিক ধর্ম ও পোপের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং তিনি রাণী হওয়ায় ফিলিপ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাণী এলিজাবেথ সিংহাসন আরোহণের পর প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম



রানী এলিজাবেথ

ও লুথারপন্থীদের মতকে সমর্থন করেন। ফিলিপ তাঁকে ঐ পথ থেকে বিরত করার জন্যে তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। এদিকে রাণী এলিজাবেথ ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যাণ্টদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে স্পেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সংঘর্ষ বাধে। ফলে বাধ্য হয়ে ফিলিপ স্পেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিরাট রণতরী ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ইংল্যাণ্ডের নৌ-বহর ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও শক্তিশালী। ড্রেক ও হকিন্স নৌ-সেনাপতি হিসেবে ছিলেন খুব সুদক্ষ। ফলে যুদ্ধের প্রথমদিকে স্পেনের রণতরী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। উহার অবশিষ্ট ঝড়ের মুখে পড়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফিলিপের প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হয়। ইতিহাসে স্পেনের ঐ আক্রমণ **'স্প্যানিশ আর্মাডা'** নামে বর্ণনা করা হয়। ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইংল্যাণ্ড ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপে ফিলিপের ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয় (জ্ঞানমূলক)
- ক) জামনীতে।
- খ) স্পেনে।
- গ) ইতালীতে।
- ঘ) বেলজিয়ামে।

২। পোপ গির্জা নির্মাণে যেভাবে অর্থ রোজগার করতেন তা হোল (জ্ঞানমূলক)
- ক) ধর্মসভার আহ্বান।
- খ) চার্চের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ।
- গ) মুক্তিপত্র বিক্রয়।
- ঘ) রাজাদের অর্থ দানে বাধ্য করা।

৩। প্রটেস্ট্যাণ্টদের খতম করার জন্য আদালতের নাম ছিল (জ্ঞানমূলক)
- ক) পার্লামেণ্ট।
- খ) সাধারণসভা।
- গ) ইনকুইজিশন্।
- ঘ) গণবিচার।

৪। সম্রাট ফিলিপকে হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা কেন মেনে নেননি (বোধমূলক)

ক) তিনি প্রটেস্ট্যাণ্ট ছিলেন।

খ) তিনি ভীরু শাসক ছিলেন।

গ) তিনি লুথারকে সমর্থন করেছিলেন।

ঘ) তিনি হল্যাণ্ডের লালিত পালিত হন নাই।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- জন ওয়াইক্লিফ /জন হাস/লুথার/ফিলিপ/জন নকস্/এলিজাবেথ কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- জার্মানীতে 'মুক্তিপত্র' বিক্রয় করতে পোপ কাকে পাঠিয়েছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- লুথারের প্রতিবাদ পত্রে কতকগুলো যুক্তি ছিল? (জ্ঞানমূলক)
- 'স্প্যানিশ আর্মাডা' কবে ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)
- জেসুইট সমিতি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞানমূলক)
- 'স্প্যানিশ আর্মাডা' র পরাজয়ের একটি ফলাফল লিখ। (বোধমূলক)
- ইউট্রেক্টের সন্ধি কত সালে ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- ধর্মসংস্কার আন্দোলন কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)
- প্রটেষ্ট্যাণ্ট কাদের বলা হয়? (জ্ঞানমূলক)
- চার্চ ও পোপের বিরুদ্ধে লুথারের কি অভিযোগ ছিল? (জ্ঞানমূলক)
- অগস্ বার্গের সন্ধির ফলাফল কি হয়েছিল? (বোধমূলক)

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি ছিল? ঐ প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফের ভূমিকা কতখানি? (জ্ঞান/প্রয়োগমূলক)
- মার্টিন লুথার কে ছিলেন? প্রটেষ্ট্যাণ্ট আন্দোলনে তাঁর অবদান লিখ। (জ্ঞান/প্রয়োগমূলক)
- ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম সংস্কারে ট্রেনটের সভা ও লায়ালার অবদান লিখ। (প্রয়োগমূলক)
- ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ। (জ্ঞান/ বোধমূলক)
- স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ কি? উহার ফল কি হয়েছিল? (জ্ঞান/ বোধমূলক)

৫

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে বিপ্লব

সূচনা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের প্রভাব ছিল অপরিসীম। রেনেসাঁসের যুগের মানুষ অভিজাত ও পাদরী পুষ্ট রাজতন্ত্রকে আর মানতে চাইলো না। তারা নানা রাজনৈতিক অধিকার দাবী করে। ফলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও বিপ্লব দেখা দেয়।

ইংল্যাণ্ডে বিপ্লবের কারণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিপ্লব দেখা দেয়। বিরোধের কয়েকটি প্রধান কারণ ছিল। (ক) ইংল্যাণ্ডে অনেকদিন থেকে রাজা ও পার্লামেণ্ট মিলিতভাবে দেশের শাসন চালাতেন। অর্থ ও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা পরামর্শ নিতেন। পার্লামেণ্টও বিবেচনা করে রাজাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু স্টুয়ার্ট আমলে ঐ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রাজা প্রথম জেমস (১৬০৩-১৬২৫) ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস (১৬২৫-১৬৪৯) উভয়ে **ঐশ্বরিক ক্ষমতার তত্ত্বে** বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে যা কিছু করার অধিকার রাজার আছে। অতএব, পার্লামেণ্টের রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। তাছাড়া, পার্লামেণ্টের অধিকার তাদের জন্মগত নয়। রাজাই সে অধিকার দিয়েছে এবং রাজার দয়ার উপর সে নির্ভরশীল। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজার ঐ নীতি মানতে রাজী ছিল না। তাদের দাবি, পার্লামেণ্টের অধিকার ও সম্মান ইংরেজ জাতির জন্মসূত্র প্রাপ্ত অধিকার। যে সব সমস্যা দেশ ও জাতির সম্মানের সঙ্গে জড়িত, সে সব বিষয়ে আলোচনা করার, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও রাজাকে পরামর্শ দেওয়া পার্লামণ্টের প্রধান দায়িত্ব। পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে রাজার কর আদায় ও বিনা বিচারে আটক করা অবৈধ। সুতরাং, দুপক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

গৃহযুদ্ধ

স্টুয়ার্ট রাজ **প্রথম জেমস** ও প্রথম চার্লস ঐশ্বরিক মতবাদ ও স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। রাজা জেমস মোট চারবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডেকেছিলেন। কিন্তু ধর্মনীতি ও কর আদায়ের প্রশ্নে পার্লামেণ্ট রাজাকে দোযারোপ করলে তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেন।

তাঁর পুত্র **প্রথম চার্লস** সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। তিনি যেমন ছিলেন চেহারায় রাজকীয়, তেমনি তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসনের ভক্ত। দেশের আইনকে খতম করে তিনি সর্বেসর্বা হতে চেয়েছিলেন। তিনি অর্থের প্রয়োজনে পার্লামেণ্ট ডাকেন। পার্লামেণ্ট তাদের অভিযোগ পেশ করা ছাড়াও তাঁর ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও বিনা অনুমতিতে কর আদায়ের নিন্দা করে। সুতরাং চার্লস পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেন এবং এগার বৎসর (১৬২৯-১৬৪০) পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন চালান। তিনি আবার



সম্রাট চার্লস



ক্রমওয়েল

পার্লামেণ্ট ডাকলে **দীর্ঘ পার্লামেণ্ট** (১৬৪০-১৬৪২) তাঁকে আইন ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করে এবং তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করে। কিন্তু চার্লস পার্লামেণ্টের ঐ ক্ষমতা মানতে রাজী হলেন না। তিনি নেতাদের বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হন এবং পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে (১৬৪২) যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

গৃহযুদ্ধ প্রায় পাঁচ বৎসর চলে। প্রথমদিকে রাজপক্ষের জয় হলেও শেষ পর্যন্ত ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট জয়ী হয় এবং চার্লসকে বন্দী করে। পরে বিচারে তাঁর শিরোচ্ছেদন করা হয়।

ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ (১৬৪৯-১৬৬০)

রাজতন্ত্রের পতনে ইংল্যাণ্ডে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমওয়েল দেশে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। প্রধানতঃ প্রজাতন্ত্র হলেও ইংল্যাণ্ডে তিনি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। দেশবাসী তাঁকে লর্ড প্রটেক্টর উপাধি দান করে। তাঁর আমলে লিখিত সংবিধান চালু হয়। তিনি পার্লামেণ্টের ক্ষমতা মেনে নেন কিন্তু অভিজাত সভা

লোপ করেন। তাঁর আমলে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডকে নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কমনওয়েলথে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে পার্লামেণ্ট রাজা প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় (১৬৬০)। এভাবে ইংল্যাণ্ডে আবার রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আবার রাজা পার্লামেণ্টে বিরোধ বাধে। দ্বিতীয় চার্লস ও ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস ক্যাথলিক ধর্ম ও স্বৈরচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। **দ্বিতীয় জেমস** সিংহাসনে আরোহণ করার পর ক্যাথলিক পাদরীদের উপর পূর্বেকার বাধা নিষেধ দূর করে তাদের সৈন্য ও শাসন বিভাগে নিয়োগ করেন। তিনি নানাভাবে স্বেচ্ছাচারী হবার চেষ্টা করেন। অপুত্রক রাজার মৃত্যুতে তাঁর প্রটেস্ট্যান্ট মেয়েদের সিংহাসনে বসার সম্ভাবনা ছিল। সেহেতু তাঁর সঙ্গে পার্লামেণ্টের সংঘর্ষ দেখা দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এক পুত্র সন্তান হলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। পার্লামেণ্ট একজোটে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর কন্যা মেরী ও হল্যাণ্ডের শাসক উইলিয়ামকে সিংহাসন আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ করে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং পার্লামেণ্ট উভয়কে ইংল্যাণ্ডের শাসক বলে ঘোষণা করে (১৬৮৯)। রাজা জেমস দেশ থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে যান। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব জয়যুক্ত হয়। বিনা রক্তপাতে ঐ বিপ্লব ঘটেছিল বলে উহাকে '**গৌরবময় বিপ্লব**' নামে অভিহিত করা হয়।

রক্তপাতহীন বিপ্লব (১৬৮৮)

ঐ বিপ্লবের **ফলাফল** ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উহার ফলে পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর হয়। পার্লামেণ্টের শাসন দেশের একমাত্র শাসন বলে গণ্য হয়। পরবর্তী রাজা কে হবেন তাও ঠিক হয়।

ফলাফল

এছাড়া, পার্লামেণ্ট 'দেশের অধিকার' আইন পাশ করে। ঐ আইনে রাজার স্বেচ্ছাচারী শাসনের নিন্দা ও নিয়মতান্ত্রিক নীতি ঘোষণা করা হয়। উহার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের শাসন চলতে থাকে। ঐ আইনে বলা হয়—

অধিকার আইন (১৬৮৯)

(ক) বেশিরভাগ লোকের ধর্ম রাজা মেনে চলবেন।

(খ) পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়া তিনি কোন আইন বাতিল কিংবা পাশ, কোন কর আদায় কিংবা সৈন্য রাখতে পারবেন না।

(গ) সদস্যদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দান।

(ঘ) বন্দী ও অপরাধীদের বিচারের স্বাধীনতা প্রদান ও জনসাধারণের রাজার

নিকট আবেদনের সুযোগ দান। এছাড়াও বর্তমান গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেছে ঐ বিপ্লব। দলীয় রাজনীতি, ক্যাবিনেন্ট প্রথা ও বিভিন্ন কক্ষ বিশিষ্ট প্রতিনিধিসভা ঐ বিপ্লবের ফলে গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। রাজা জেমস যে নীতিতে বিশ্বাস করতেন তার নাম (জ্ঞানমূলক)

ক) পালার্মেন্টকে মেনে চলা।

খ) জনমত মেনে চলা।

গ) ঐশ্বরিক ক্ষমতার তত্ত্ব।

ঘ) চার্চ দ্বারা অনুমোদিত নীতি।

২। রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলেছিল (জ্ঞানমূলক)

ক) ১১ বছর।

খ) ৫ বছর।

গ) ২২ বছর।

ঘ) ১২ বছর।

৩। গৌরবময় বিপ্লবের অন্যতম ফলাফল ছিল (বোধমূলক)

ক) পার্লামেন্টের শাসন দেশের একমাত্র শাসন বলে গণ্য হয়।

খ) রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ) চার্চের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ) প্রচণ্ড রক্তপাতে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- ঐশ্বরিক মতবাদ কি? (জ্ঞানমূলক)
- রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের মূল যুক্তি কি ছিল? (বোধমূলক)
- অধিকার আইন কি? (বোধমূলক)
- গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। (বোধমূলক)

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- ইংল্যাণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ কি? (জ্ঞানমূলক)
- গৃহযুদ্ধ কিভাবে ঘটেছিল? (বোধমূলক)
- রাজা প্রথম চার্লসের ভূমিকা কি ছিল? (প্রয়োগমূলক)
- গৌরবময় বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (জ্ঞান/বোধমূলক)

—

৬

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান

(১৫২৬—১৭০৭)

(খৃঃ)

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাদশাহ জাহিরুদ্দিন মোহাম্মাদ বাবর। ভাগ্যহারা বাবার **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতা ওমরশেখ মির্জা ছিলেন মধ্য-এশিয়ার ফারগণা রাজ্যের অধিপতি। **বাবর** ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধর। সেজন্য তাঁর বংশকে **'মুঘল বংশ'** বলা হয়। পাণিপথের যুদ্ধের পর তিনি রাজপুত বীর রাণা সংগ্রাম সিংহ ও আফগানদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। ১৫৩০ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সন্তান স্নেহ ছিল অসাধারণ। তিনি ভারতে প্রথম কামান ও বারুদের ব্যবহার করেছিলেন।

বাবর

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **হুমায়ুন** দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি মালব ও কালিঞ্জর জয় করেন। কিন্তু দু'জন আফগান বীর বাহাদুর শাহ ও শের খাঁ তাঁর বিরোধিতা করেন। তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহকে পরাজিত করলেও বিহারের আফগান শাসকর্তা **শের খাঁর** হাতে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হন (১৫৪০) ও দিল্লীর সিংহাসন হারান। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। শেরশাহ তাঁর আদর্শ শাসনব্যবস্থার জন্যে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি শাসনব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। তিনি দেশের জমি জরীপ করে প্রজাদের জমির পাট্টা দান করেন। দেশকে সরকার ও সরকারকে পরগণায় বিভক্ত করেন। কিন্তু শেরশাহ ১৫৪৫ সালে মারা গেলে সাম্রাজ্যে গোলমাল দেখা দেয়। সেই সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হুমায়ুন

হুমায়ুন যখন রাজ্যহারা, তখন সিন্ধুপ্রদেশের অমরকোট নামক স্থানে এক হিন্দু রাজার আশ্রয়ে **আকবর** জন্মগ্রহণ করেন (১৫৪২)। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র তের বছর বয়সে তিনি দিল্লীর বাদশাহ হন। সিংহাসনে তাঁকে সাহায্য করতেন



বাবর



আকবর

পিতার বন্ধু ও বিশ্বস্ত অভিভাবক বৈরাম খান। ইতিমধ্যে আদিলশাহের সেনাপতি হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। বৈরাম খান ও আকবর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে **দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে** হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজ হাতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর আমলে মালব, গণ্ডোয়ানা, গুজরাট, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হয়। বাংলাদেশের বারভূঁইয়া ও গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী বীরত্ব প্রদর্শন করেও পরাজিত হন। দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ, বিজাপুর ও আহম্মদনগর তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। বিজাপুরের চাঁদ সুলতানা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, কাবুল, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান তাঁর অধীন হয়। আকবর বুঝেছিলেন যে, ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে গেলে সকল হিন্দু ও রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা প্রয়োজন। রাজা বিহারীমল তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র রাজপুত মানসিংহ ছিলেন আকবরের প্রধান সেনাপতি। বহু রাজপুত রাজ্য তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। চিতোরের রাণা প্রতাপ আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করায় ১৫৭৬ সালে হল্‌দিঘাট প্রান্তরে দু'পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন। কিন্তু তিনি সারাজীবন দেশ উদ্ধারের জন্য আমরণ যুদ্ধ করে গেছেন।

আকবর

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন মুঘল বংশের তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি এক উন্নত শাসনব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের ভালবাসা লাভ করেন। সকলকে একডোরে বাঁধবার জন্যে তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে **দীন-ই-এলাহি** ধর্মের প্রবর্তন করেন। ফতেপুর সিক্রির এবাদত-খানায় সম্রাট সর্ব ধর্মের লোকদের নিয়ে ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করতেন।

জাহাঙ্গীর

পুত্র সেলিম **জাহাঙ্গীর** নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে মেবার, আহম্মদনগর, কাংড়া দুর্গ ও বাংলাদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কান্দাহার হাতছাড়া হয়ে যায়। কিছুকাল সম্রাজ্ঞী **নূরজাহান** শাসনকার্যে সর্বেসর্বা ছিলেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যু হয়।

শাহজাহান

পরবর্তী সম্রাট **শাহজাহান** বুন্দেলখণ্ডের রাজার বিদ্রোহ ও হুগলীর পোর্তুগীজদের দমন করতে আদেশ দেন। আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর অধীন হয়। কিন্তু কান্দাহার দখলে তিনি ব্যর্থ হন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোঘল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। তিনি লালকেল্লা, আগ্রার দুর্গ, মোতি মসজিদ, জুম্মামসজিদ, দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি বড়বড় ইমারত তৈরী করেন। তাঁর তৈরী **'তাজমহল'** পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম।

উত্তরাধিকার যুদ্ধ

শাহজাহানের চারটি পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত দারাশিকো দিল্লীতে সম্রাটের সঙ্গে বাস করতেন। দ্বিতীয়পুত্র সুজা ছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদার। তৃতীয় পুত্র চতুর ঔরংজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ও কনিষ্ঠপুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক। শাহজাহান একবার কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লে চারিদিকে মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাইরের তিন পুত্র নিজেদেরকে সম্রাট ঘোষণা করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন (১৬৫৭)। পথিমধ্যে ঔরংজেব ও মুরাদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির চুক্তি হয়। তাঁদের মিলিত বাহিনী দারাশিকো ও সুজাকে পরাস্ত করে। তিনি পিতা শাহজাহানকে বন্দী করেন। পরে দারাশিকো ও মুরাদকে হত্যা ও সুজাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে **ঔরংজেব** দিল্লীর সম্রাট হন (১৬৫৮)।

ঔরংজেব

তিনি "আলমগীর" বা বিশ্বজয়ী উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আসাম ও চট্টগ্রাম দখল করেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা নেতা **শিবাজীকে** তিনি বশে আনতে পারেন নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর পুত্র শম্ভুজী মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবও আর্থিক কারণে রাজপুত, সৎনামী ও কিছু জাতি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে ঐসব বিদ্রোহ

দমনে তাঁর বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাঁর আমলে মুঘল সাম্রাজ্য ভারতের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত হয়। ১৭০৭ সালে তিনি ৮৯ বছর বয়সে আহম্মদনগরে প্রাণত্যাগ করেন।



শাহজাহান



ঔরংজেব

তিনি ছিলেন সমরকুশল সেনাপতি ও কূটকৌশলী। কারও কারও মতে তিনি ছিলেন পরধর্ম অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর।

(খ) মুঘল শাসনের বৈশিষ্ট্য ঃ

মুঘল শাসনব্যবস্থায় বাদশাহ ছিলেন রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। সামরিক শক্তির উপর তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি মেনে চলতেন। ফলে শাসক ও প্রজার মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। একমাত্র ঔরঙ্গজেবের ভুল নীতির ফলে সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়।

মুঘলযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হল ভারতের সাংস্কৃতিক সমন্বয়। আকবরের দীন-ই-এলাহি এবং সুফী মতবাদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে আসে। দু' সম্প্রদায় একে অপরের ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করতে থাকে। নতুন উর্দু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। খাদ্য, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক অবস্থা

ঐ যুগে সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল। শীর্ষে ছিলেন ভোগবিলাসী শরীফ বা অভিজাত ও আমীর ওমরাহ। তাঁরা রাষ্ট্রের সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। তদের মধ্যে মদ্যপান ও নানা কু-অভ্যাস দেখা যায়। নারীদের উপর প্রচুর বাধানিষেধ ছিল। তার নীচে ছিল ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সবার নীচে ছিল আজ্‌লাফ বা অন্যান্য সাধারণ মানুষ। জাতিভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ ও পণপ্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল।

ঐ যুগে কৃষিই ছিল দেশের প্রধান ভিত্তি। শিল্পেও মুঘলযুগ উন্নত ছিল। সূতী ও মসলিন রেশমী কাপড়ও নানা ধরনের অলংকার বিদেশে রপ্তানী হোত। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, লাহোর, পাটনা, ঢাকা, বর্ধমান প্রভৃতি শহর এবং সপ্তগ্রাম কালিকট, সুরাট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর ছিল প্রসিদ্ধ। দেশে বেকারত্ব প্রায়ই ছিল না। তবে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হতো। জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা। এক টাকায় ৫০ সের চাল ও দশ সের ঘি পাওয়া যেত। যানবাহনের অভাব ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

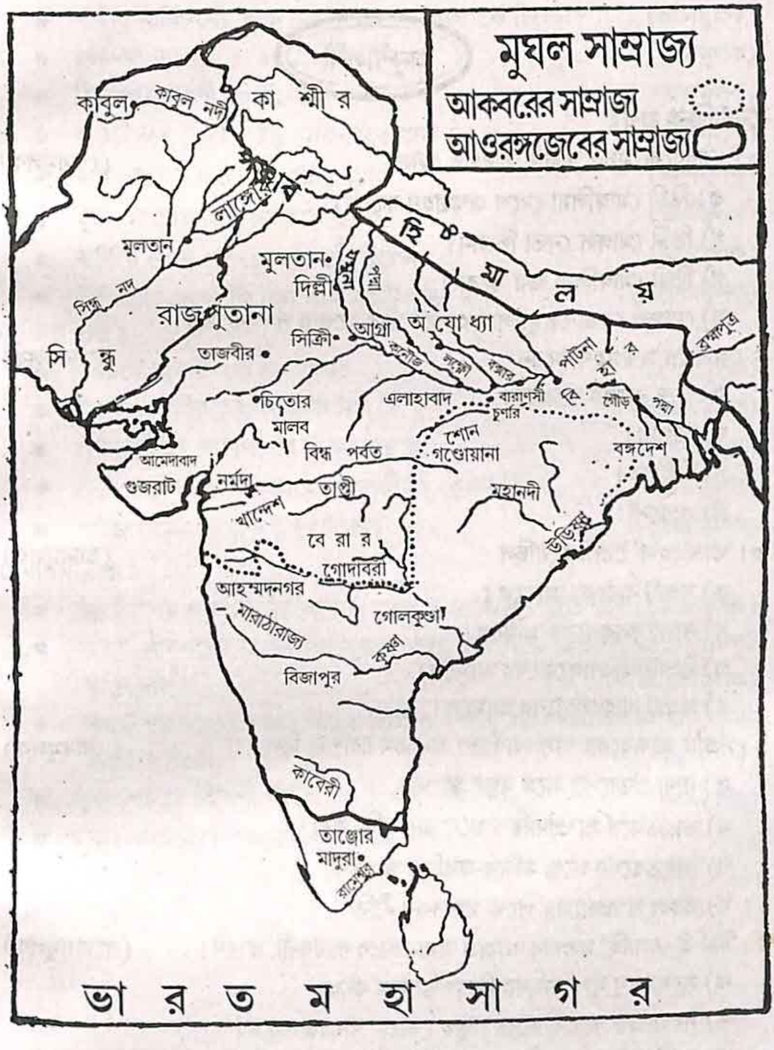
মুঘল আমলে বহু **বিদেশী পর্যটক** ভারতে আসেন। পাদরী মনসেরেট সম্রাট আকবরের আমলে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে আকবরের উদার মনের পরিচয় পাই। ইংরেজ টমাস রো ও হকিন্সের বর্ণনায় জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রাচুর্য, কৃষকদের দুর্দশার চিত্র, শিল্পের উন্নতি ও শাসনের দোষত্রুটির কথা আছে। শাহজাহানের রাজত্বকালে বার্ণিয়ে ও তেভার্নিয়ে নামে দুজন ফরাসী এবং মানুচি নামে একজন ইতালী দেশের পর্যটক এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মতে, শাহজাহান পিতার মত ব্যবহার করতেন। দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বিরাজ করত। হিন্দুদের নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল। ঐশ্বর্যের কথা বার্ণিয়ে বলেছেন। মনসেরেট ও র‍্যালফ্ ফিচের বর্ণনায় নানা শহরের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। দেশের দুর্ভিক্ষ, ধনবৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্যের কথা তাঁরা তুলে ধরেছেন।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

(গ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭—১৭৫৭) ঃ

ঔরঙ্গজেবের আমলে মারাঠা, রাজপুত ও নানাজাতির বিদ্রোহ মুঘল শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন ও সম্রাটদের স্বৈরাচারী শাসন পতনের অন্যতম কারণ ছিল। মন্ত্রীদের অযোগ্যতা ও অত্যাচার, রাজকোষের শূন্যতা অবস্থার অবনতি ঘটায়। কিন্তু সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয় ঔরংজেবের মৃত্যুর পর। পুত্র বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) ছিলেন বৃদ্ধ ও রাজকার্যে অমনোযোগী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে মুঘল দরবারে শিয়া, সুন্নী ও হিন্দুস্থানী দলের সৃষ্টি হয় এবং একে অপরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সম্রাটগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা সিহাসনে আরোহণ করেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তারাই সম্রাট ঠিক করতেন। অনেকে আবার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। অবশেষে অভিজাতদের সংঘর্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হন। ঐ বিশৃঙ্খলার সুযোগে পূর্ব ভারতে আলিবর্দি খান, দাক্ষিণাত্যে নিজাম, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মুহাম্মদ শাহের আমলে সাম্রাজ্যে

শেষ আঘাত হানে পারস্যের নাদিরশাহ (১৭৩৯) ও আফগান সর্দার আহম্মদ শাহ আবদালীর (১৭৪৮) ভারত আক্রমণ। ঐ আক্রমণের ফলে দিল্লী শ্মশানে পরিণত হয়। লুঠতরাজ ও নরহত্যা চরমে পৌঁছে। পরবর্তী সম্রাট আহম্মদ শাহ ও দ্বিতীয়



আলমগীর ছিলেন অকর্মণ্য প্রকৃতির। সুতরাং সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঐ অরাজকতার সুযোগে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা পলাশীর মাঠে বাংলার

নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে হারিয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মূঘল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন মুছে যায় ১৮৫৭ সালে। ঐ সময় ভারতীয় মহাবিদ্রোহে সম্রাট বাহাদুর শাহ অংশ নিলে ইংরেজরা তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১। বাবরকে 'মুঘল' বলার তাৎপর্য হোল (বোধমূলক)

ক) তিনি মোঙ্গলিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন।
খ) তিনি মোঙ্গল নেতা ছিলেন।
গ) তিনি মোঙ্গলিয়া জয় করেন।
ঘ) মোঙ্গল নেতা তৈমুরলঙ্গের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল।

২। আকবর জন্মগ্রহণ করেন (জ্ঞানমূলক)

ক) হিন্দু রাজার আশ্রয়ে।
খ) আগ্রায়।
গ) দিল্লীতে।
ঘ) পারস্যে।

৩। 'তাজমহল' তৈরী হয়েছিল (জ্ঞানমূলক)

ক) সম্রাট বাবরের আমলে।
খ) সম্রাট আকবরের আমলে।
গ) সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে।
ঘ) সম্রাট শাহজাহানের আমলে।

৪। সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল (বোধমূলক)

ক) রাণা প্রতাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন।
খ) ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি করা।
গ) ভারতবর্ষের মধ্যে মন্দির-মসজিদ স্থাপন।
ঘ) সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলকর নীতি।

৫। 'দীন-ই-এলাহি' মতবাদ আজও সমানভাবে কার্যকরী, কারণ। (প্রয়োগমূলক)

ক) সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা দান করে।
খ) সংখ্যাগুরু ভারতীয়দের বন্ধুত্ব ডোরে বাঁধতে পারে।
গ) ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি হ্রাস করতে পারে।
ঘ) ভারতের সঙ্গে বহির্দেশের যোগাযোগ বাড়াতে পারে।

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- বাবরের প্রকৃত নাম কি?

- বাদশাহ উপাধি কে ধারণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
- ভারতে প্রথম কামানের ব্যবহার কোন্ সম্রাট করেছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- শেরশাহ্ কত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- আকবরের পূর্বে মুঘল বাদশাহ কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আকবরের প্রতিপক্ষ কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- হলদিঘাটের যুদ্ধ কবে ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)
- বিজাপুরের রাণী কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- বাংলাদেশে কোন্ গোষ্ঠী আকবরকে বাধা দেন? (জ্ঞানমূলক)
- আওরঙ্গজেব কত সালে মারা যান? (জ্ঞানমূলক)
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতন কবে ঘটে? (জ্ঞানমূলক)
- বার্নিয়ে কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- উর্দুভাষার গুরুত্ব কি ছিল তার একটি যুক্তি দাও— (প্রয়োগমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- বাবরকে 'মুঘল' বলা হয় কেন? (বোধমূলক)
- দীন-ই-এলাহির তাৎপর্য কোথায়? (বোধমূলক)
- প্রথম/দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব। (বোধমূলক)
- রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের শাসননীতি কেমন ছিল। (জ্ঞানমূলক)
- শাহজাহানের আমলে উত্তরাধিকার যুদ্ধ। (জ্ঞানমূলক)

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার লিখ। (জ্ঞানমূলক)
- সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-দশটি যুক্তি দাও। (প্রয়োগমূলক)
- সম্রাট শাহজাহান ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘলযুগের নানান অবদান ও বিস্তৃতির ইতিহাস লিখ। (বোধ/জ্ঞানমূলক)
- মুঘল শাসনে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ বর্ণনা কর। (জ্ঞানমূলক)
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ৫টি কারণ লিখ।

—

(ক) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঃ

বহু প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভারতে আসার চেষ্টা করে। অবশেষে ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগাল থেকে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। তাঁদের পথ ধরে ভারতে আসে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ। পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল গোয়া, দমন, দিউ ও হুগলী। ওলন্দাজের প্রধান কুঠি ছিল সুরাট ও চুঁচুড়া। ১৬০০ সালে ইংরেজ ও ১৬৬৪ সালে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ফরাসীদের কেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরী, চন্দননগর ও সুরাট। ইংরেজগণ মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বাই, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করে। জব চার্ণক ১৬৯০ সালে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ঐ দ্বন্দ্বে ফ্রান্স ও ইংরেজদের হাতে ইউরোপের অন্যান্য শক্তি পরাজিত হলে তাঁরা পরস্পরের মুখোমুখি হন।



ভাস্কো-ডা-গামা



ডুপ্লে

ফলে ইউরোপে দু'দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৬৩) ঃ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজ্যে উত্তরাধিকার প্রশ্নে দু'পক্ষে সংঘর্ষ দেখা দেয়। প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে (১৭৪০-১৭৪৮)। পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা ডুপ্লে জয়ী হন। ডুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আবার কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসন নিয়ে দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ বাধে (১৭৫১-৫৪)। যুদ্ধে ডুপ্লে পরাজিত হন এবং হতাশ হয়ে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। শেষে ইংরেজরা চন্দননগর অধিকার করে ও বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) সেনাপতি লালী ইংরেজদের হাতে বন্দী হন।

এদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে জয়লাভের ফলে ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয়। এভাবে পর্তুগীজদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়।

(খ) মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ও প্রসার ঃ

পূর্বে মারাঠাগণ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাদের আদি নিবাস ছিল পর্বত ও নদীবেষ্টিত মহারাষ্ট্র দেশ। বিভিন্ন সময় ঐ দেশ বিভিন্ন দেশের অধীন ছিল। মারাঠা জাতির উত্থান শুরু হয় শিবাজীকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তাঁর সংগঠন প্রতিভা মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ করে।

শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০) ঃ বিজাপুর সুলতানের কর্মচারী শাহজীর পুত্র শিবাজী পুনা জেলার শিবনের গিরিদুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকে মাতা জীজাবাঈ ও পণ্ডিত দাদাজী কোণ্ডদেবের প্রভাবে লালিত পালিত হন এবং ভারতে একটি মারাঠা রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন।



শিবাজী

বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ প্রথমে কৃষক সৈন্যের সাহায্যে তিনি বিজাপুর রাজ্যের কিছু কিছু দুর্গ ও অঞ্চল জয় করেন। পরে রায়গড়, জাউলী ও কোঙ্কনের কিছু অংশ তাঁর অধীন হয়। ফলে বিজাপুরের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যুদ্ধ বাধে। তিনি বিজাপুরের প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁকে হত্যা করে বিজাপুর বাহিনীকে পরাজিত করেন। শিবাজী আরও কিছু অংশ জয় করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন।

মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন শিবাজীর শত্রুতায় বিরক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং সম্রাট হবার পরে তিনি শায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি পরাজিত হন। পরে জয়সিংহ ও দিলীপ খাঁর নিকট শিবাজী পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন (১৬৬৫)। কিন্তু তাঁর সাহায্যে সন্তুষ্ট হয়ে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেন ও তাঁকে বন্দী করেন। পরে তিনি কৌশলে পলায়ন করেন। সম্রাট তাঁকে বশে আনার জন্য 'রাজা' উপাধি দান করেন, কিন্তু দুপক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। তারপর শিবাজী হারানো দুর্গগুলো জয় করতে সমর্থ হন এবং নিজে **'ছত্রপতি'** উপাধি ধারণ করে রায়গড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৭৪)। মৃত্যুকালে জিঞ্জি, ভেলোর, কোঙ্কন, রায়গড় প্রভৃতি

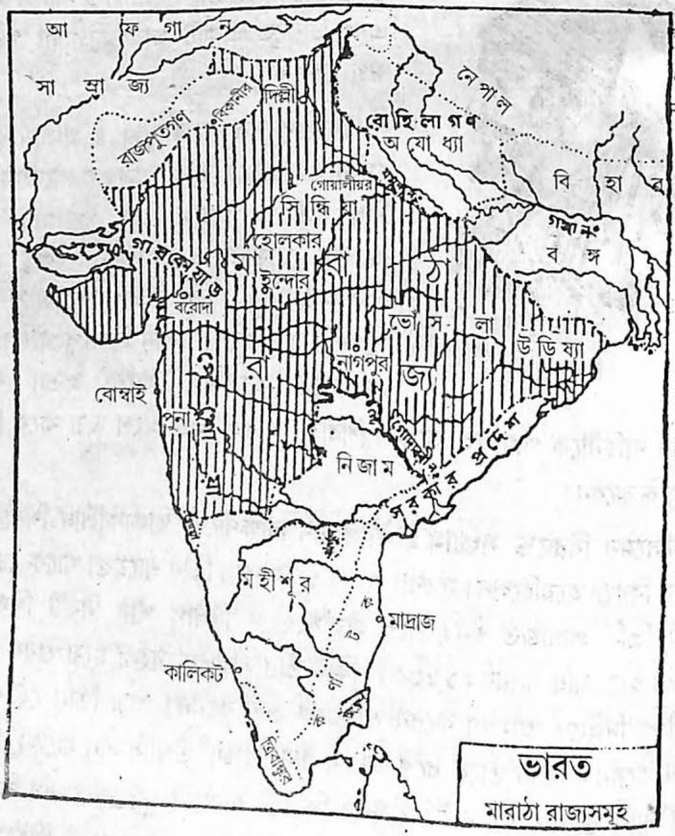
এক বিরাট অঞ্চলের উপর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী মুঘলদের হাতে নিহত হন। রায়গড় সমেত সাতারা, জিঞ্জি ও অন্যান্য দুর্গও মুঘলরা দখল করে। ঐ অবস্থা সত্ত্বেও ভ্রাতা রাজারাম ও পত্নী তারাবাঈ সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু শম্ভুজীপুত্র শাহু মুক্তি পেলে তাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তবুও ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের দমন করতে পারেন না।

পেশোয়াপদের সৃষ্টি

সাতারায় শাহুর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন **বালাজী বিশ্বনাথ** নামে এক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্মচারী। শাহু তাঁকে 'পেশোয়া' পদে নিয়োগ করেন (১৭১৩)। তিনি রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। পেশোয়ারা পুনা থেকে রাজ্য চালাতেন।

তিনি মুঘল বাদশাহের সঙ্গে চুক্তির বিনিময়ে শিবাজীর হৃত অঞ্চল সমেত



হায়দ্রাবাদ, বিজাপুরসহ ছয়টি সুবা লাভ করেন। দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও

(১৭২০-৪০) মারাঠা শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি ভারতে হিন্দু-পাদশাহী (সাম্রাজ্য) স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর বাহিনী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে দিল্লীর উপকণ্ঠে হাজির হয়। তিনি নিজাম ও পর্তুগীজদের হারিয়ে বিরাট অঞ্চল দখল করেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হবার পূর্বেই ১৭৪০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জায়গীর প্রথা প্রবর্তনের ফলে মারাঠাদের মধ্যে শক্তিশালী মারাঠা সামন্তগণ নিজ নিজ স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। এভাবে নাগপুরে ভোঁসলে, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, বরোদায় গাইকোয়াড়, ইন্দোরে হোলকার ও মালবে পবার রাজ্য সৃষ্টি হয়। প্রথম বাজীরাও তাঁদের নিয়ে **'মারাঠা রাজ্য সঙ্ঘ'** গঠন করেন।

তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজীরাও (১৭৪০—১৭৬১) মারাঠা হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ত্যাগ করেন। তাঁর আমলে ভারতের এক বিরাট অংশে মারাঠা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বে মারাঠাগণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ ১৭৬১

ইতিমধ্যে মারাঠাগণ আফগানদের কাছ থেকে পাঞ্জাব দখল করেন। ফলে আফগানবীর আহম্মদশাহ আবদালী মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পাণিপথের প্রান্তরে আফগানবাহিনী সম্পূর্ণভাবে মারাঠাদের পরাজিত করে। বাজীরাও এর অল্পদিন পরে মারা যান। ভারতে মারাঠাদের গৌরব লুপ্ত হয়।

(গ) শিখ শক্তির উত্থান ঃ

শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন গুরু নানক। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ ধর্ম পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চম গুরু অর্জুনের সময় থেকে শিখ জাতি রাজনীতিতে প্রবেশ করতে থাকে। পবিত্র 'গ্রন্থসাহেব' সঙ্কলন ও 'মসন্দ' প্রথা (স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠানে অর্থ দান) প্রবর্তন করে তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবোধ ধারণা গড়ে তোলেন। বিদ্রোহী সম্রাট পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৬০৬)। কিন্তু শিখজাতিকে সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন গুরু হরগোবিন্দ সিংহ। নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঔরঙ্গজেবের নীতির বিরোধিতা করার ফলে ধৃত ও নিহত হন। শিখ জাতিকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেন দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ। 'এক জাতি এক প্রাণ' নীতির ভিত্তিতে তিনি তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন। এজন্য তিনি 'খালসার' (পবিত্র অনুষ্ঠান) সৃষ্টি করেন এবং ঐ পবিত্র শিখদের প্রতীক 'পঞ্চ ক' — কেশ, কংগা (চিরুণী), কচ্ছা (ছোট জাঙ্গিয়া), কড়া (বালা) ও কৃপাণ বাধ্যতামূলক করেন। তাঁর বাহিনীর সঙ্গে মুঘল বাহিনীর যুদ্ধ হয়। ঔরঙ্গজেব শিখদের প্রভাব খর্ব

করতে পারেন নাই। পরে তাঁদের নেতা বান্দা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল জয় করে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন ও দুর্গও নির্মাণ করেন। ইতিমধ্যে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে পাঞ্জাব আফগানদের অধিকার আসে। পরে শিখরা নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের রাজ্য বা মিস্‌লএ বিভক্ত হয়।



গুরু গোবিন্দ সিংহ



রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ সিংহ (১৭৮০—১৮৩৯) ঃ

কূটনীতি ও বাহুবলে বিচ্ছিন্ন শিখদের এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে তোলেন রণজিৎ সিংহ। তিনি ১৭৮০ সালে সুকেরচাকিয়া মিস্‌ল-এ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগানিস্তানের জামান শাহকে সাহায্য করায় তিনি লাহোরের শাসনভার ও রাজা উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি পাশ্ববর্তী অঞ্চল, অমৃতসর ও লুধিয়ানা জয় করেন। তিনি শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরের মিসল্‌গুলো জয় করতে উদ্যত হলে তাঁরা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে তিনি বাধা পান এবং ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯) করতে বাধ্য হন। তিনি মূলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার রাজ্যভুক্ত করেন ও আফগানদের পরাজিত করেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। শিখ শক্তির প্রতিষ্ঠা তাঁর এক অসাধারণ কীর্তি। তাঁর মৃত্যুর পর শিখ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজদের অধীন হয়।

খালসা

শিখ সংগঠন ঃ গুরু গোবিন্দ সিংহ এক বৈশাখী তিথিতে শিখদের মধ্যে এক নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। উহাকে বলা হয় 'খালসা'। 'খালসা' শব্দের অর্থ পবিত্র। সেখানে সবাই সমান। উদ্দেশ্য ছিল তারা ভ্রাতৃত্ব ও বীরত্বের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠবে। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি পাঁচজন শিষ্যকে দীক্ষা দেন ও তিনি নিজে তাদের কাছ

থেকে দীক্ষা নেন। দীক্ষা শেষে শিখরা হবে সিংহ এবং তাদের পোষাক হবে পঞ্চ 'ক'-এর সমাহার।

মিস্‌ল

শিখ জাতির উত্থানের ঠিক মধ্য পর্বে মিস্‌ল নামক এক ধর্মীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। এটা ছিল সৈন্যদের সংগঠন। জানা যায়, দশম গুরুর মৃত্যুর পর শিখরা বিভিন্ন শুভদিনে অমৃতসরে মিলিত হতেন ও ধর্ম-গ্রন্থকে সামনে রেখে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। প্রত্যেক মিস্‌লএ একজন সর্দার ছিলেন। তিনি ছিলেন মিস্‌ল-এর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। সেখানে পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। তারা মনে করতেন ভগবান পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করেন।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

ক) ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে পৌঁছান
- ক) ১৪৯৮ সালে।
- খ) ১৮৫৭ সালে।
- গ) ১৮৮৫ সালে।
- ঘ) ১৯০৫ সালে।

২। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে যে উপাধি প্রদান করেন তা হোল
- ক) নবাব।
- খ) মনসবদার।
- গ) জায়গীরদার।
- ঘ) রাজা।

৩। প্রথম পেশোয়া ছিলেন
- ক) শিবাজী।
- খ) শম্ভুজী।
- গ) বালাজী বিশ্বনাথ।
- ঘ) তারাবাঈ।

৪। পঞ্চ 'ক' এর প্রবর্তন করেন
- ক) গুরু নানক।
- খ) গুরু তেগবাহাদুর।
- গ) গুরু গোবিন্দ সিংহ।
- ঘ) গুরু অর্জুন সিংহ।

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র পূর্ব ভারতে কোথায় ছিল?

- ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞানমূলক)
- কলকাতা কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)
- প্রথম/কর্ণাটক/দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে ঘটে? (জ্ঞানমূলক)
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসী নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- বন্দীবাসের যুদ্ধ কত সালে ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)
- শিবাজীর কোথায় জন্ম হয়? (জ্ঞানমূলক)
- শিবাজী কোন্ উপাধি ধারণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
- তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ কবে ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)
- ঐ যুদ্ধে কে কে প্রতিপক্ষ ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
- শিখধর্মের প্রবর্তক কে? (জ্ঞানমূলক)
- শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (জ্ঞানমূলক)
- অমৃতসরের সন্ধি কবে হয়েছিল? (জ্ঞানমূলক)
- রণজিৎ সিংহের প্রধান কীর্তি কোথায়? (বোধমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- হিন্দু পাদশাহী কি? (জ্ঞানমূলক)
- মিস্ল/খালসা/পঞ্চ 'ক' কি? (জ্ঞানমূলক)
- বিদেশী বণিকগণ ভারতে কেন এসেছিলেন? (বোধমূলক)

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- ইংরেজ ও ফরাসীদের সংঘর্ষ ও তার ফলাফল লিখ। (জ্ঞান-বোধমূলক)
- শিবাজীর কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি কিভাবে মারাঠা শক্তিকে শক্তিশালী করেন? (জ্ঞান-বোধমূলক)
- পেশোয়া পদের কিভাবে সৃষ্টি হয়? তাদের অবদান বর্ণনা কর। (বোধ/প্রয়োগমূলক)
- শিখশক্তির উত্থান ও গুরুদেব রণজিৎ সিংহের ভূমিকা লিখ। (জ্ঞান-প্রয়োগমূলক)

—

৭

ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার

(ক) প্রথম পর্যায় (১৭৫৭-১৮১৮)

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে আলিবর্দী খান বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। কিন্তু আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগম, প্রধান মন্ত্রী মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতি সিরাজকে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদিকে ইংরেজরা নবাবের আদেশ অমান্য করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় ও কলিকাতায় দুর্গের সংস্কার করতে থাকে। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে নবাব ইংরেজ কুঠি কাশিমবাজার ও কলিকাতা অধিকার করেন (১৭৫৬)। ঐ খবর মাদ্রাজে পৌছলে রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁর নৌ সেনাপতি ওয়াটসন সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে দুপক্ষে যুদ্ধ হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতায় ইংরেজরা খুব সহজে জয়লাভ

ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা



সিরাজদ্দৌলা



ক্লাইভ

করে। সিরাজ ধৃত ও নিহত হন। ঐ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলা তথা ভারতে

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। পূর্বের চুক্তিমত ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসালেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ইংরেজরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন ও তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাব করেন। কিন্তু তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। ফলে তিনি রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি পরাজিত হন। শেষে তিনি **বক্সারের যুদ্ধেও** (১৭৬৪) পরাজিত হন। পরে তাঁর পুত্র নবাব হন, কিন্তু নবাবদের আর কোন ক্ষমতাই রইল না। ইতিমধ্যে ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের জন্যে বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন (১৭৬৫) এবং ঐ বৎসর পরাজিত ও অসহায় সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার **দেওয়ানী** লাভ করেন। অযোধ্যায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ক্লাইভের **'দ্বৈতশাসনের'** ফলে নবাব খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু খাজনার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। সুতরাং নবাব হলেন ক্ষমতাসীন দায়িত্বের অধিকারী, আর ইংরেজদের হাতে রইল দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

দ্বৈতশাসন

বাংলার পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল **ওয়ারেন হেষ্টিংস** (১৭৭২-৮৫)। তিনি প্রথম থেকেই ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রসারে চেষ্টা করেন। রোহিলা যুদ্ধে তিনি অযোধ্যাকে সৈন্য সাহায্য দিয়ে সেখানে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। এদিকে পেশোয়া পদ নিয়ে রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে মারাঠা প্রধান ও নানা ফড়নবীশের গণ্ডগোল দেখা দিলে ইংরেজগণ রঘুনাথ রাওকে সমর্থন করে। দুপক্ষে **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা** যুদ্ধ শুরু হয়। সন্ধির ফলে সল্‌সেট্ ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে শক্তিশালী মহীশূর রাজ্যের

ওয়ারেন হেস্টিংস



ওয়ারেন হেস্টিংস



টিপু সুলতান

সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে। **হায়দার আলীর** নেতৃত্বে ঐ রাজ্য দাক্ষিণাত্যে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বিপদ বুঝে মারাঠা ও নিজামের

সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হয় এবং দুপক্ষ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ইংরেজগণ ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। পরে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত মাহে ইংরেজগণ আক্রমণ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বাধে। ফরাসিগণও তাঁকে সাহায্য করে। যুদ্ধের মধ্যে হায়দর মারা যান ও তাঁর পুত্র টিপু বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু কোন পক্ষই সুবিধে করতে পারে না। হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ কলিকাতায় স্থানান্তর ও কলিকাতায় সদর ও নিজামত কোর্ট তৈরি করে ইংরেজ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেন।

ইতিমধ্যে **টিপু**ও ফরাসীদের সাহায্যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেন। ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে শুরু হয় তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। যুদ্ধে টিপু পরাজিত হন এবং বহু ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার শ্রেণী তৈরি করে সাম্রাজ্যকে মজবুত করেছিলেন।

ইংরেজ শক্তিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন লর্ড **ওয়েলেস্‌লী** (১৭৮৯-১৮০৫)। এজন্য তিনি **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির** প্রবর্তন করেন। উহাতে বলা হয়, যে সব ভারতীয় রাজ্য ঐ নীতি গ্রহণ করবে, ইংরেজ সরকার তাদের বাইরের ও দেশের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। তারা বাইরের কোন দেশের সঙ্গে কোন প্রকার আপস আলোচনা বা সন্ধি করতে পারবে না। দেশের সৈন্যের ভার একজন ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত হবে। এভাবে তিনি ভারতীয় রাজাদের বৃটিশের অধীনে আনতে চেষ্টা করেন। নিজাম ঐ প্রস্তাব মেনে



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

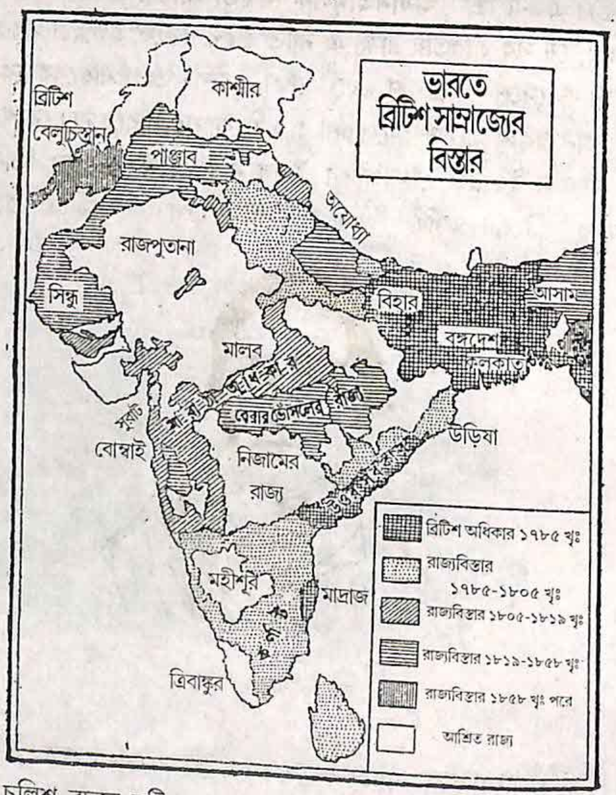
নেন। টিপু সুলতান উহা অগ্রাহ্য করলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বাধে। টিপু অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান ও ঐ রাজ্যের পতন হয়। দ্বিতীয়

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর মারাঠা নেতারা ঐ নীতি মেনে নেন। এ ছাড়াও কর্ণাটক, তাঞ্জোর, সুরাট ও অযোধ্যা রাজ্যের একাংশ তিনি অধিকার করেছিলেন। লর্ড মিন্টো উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তৃত করেন।

লর্ড হেস্টিংস বা ময়রার আমলে নেপালীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ইঙ্গ-নেপালী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ইংরেজগণ নৈনিতাল, মুসৌরী, সিমলা ও তরাই অঞ্চলের কিছু অংশ অধিকার করে। মধ্যভারতের পিণ্ডারী দস্যুদের দমনে রাজপুতানা অধিকারে আসে। ইংরেজদের প্রভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে মারাঠাগণ একজোটে পুণার রেসিডেণ্ট ভবন আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পতন হয়। পেশোয়াকে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং পেশোয়ার রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজরা দখল করে। ভোঁসলে ও হোলকার অধীনতা স্বীকার করেন।

লর্ড হেস্টিংস
(১৮০৯-১৮২৩)

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় (১৮১৮—১৮৫৭) ঃ



পরবর্তী চল্লিশ বছরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার আরও বিস্তৃত হয়। ঐ সময়

ভরতপুর দুর্গ তারা অধিকার করে। **লর্ড উইলিয়াম** বেন্টিঙ্ক (১৮২৯-১৮৩৫) কূর্গ, মহীশূর, জয়ন্তিয়া ও কাছাড় জিলা সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সিন্ধুপ্রদেশও অধীন হয়। ঐ সময় এক গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ। যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হয়। লাহোরের সন্ধি অনুসারে কিছু অংশ ইংরেজদের অধীন হয়।

কিন্তু বৃটিশ শক্তির বিস্তার ঘটে **ডালহৌসীর** শাসনকালে। সাম্রাজ্য প্রসারে তিনি **স্বত্ববিলোপ নীতির** প্রবর্তন করেন। উহার ফলে বৃটিশ আশ্রিত কোন রাজ্য অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন দত্তকপুত্র গ্রহণ করা চলবে না। এর ফলে নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং কর্ণাটক, তাঞ্জোর ও পেশোয়ার দত্তকপুত্রদের বৃত্তি বন্ধ হয়। এদিকে শিখরা লাহোরের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মানতে রাজী না হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ যুদ্ধে শিখ রাজ্যের পতন ঘটে (১৮৪৯)। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্য, বেরার, অযোধ্যা ও চট্টগ্রাম তিনি অধিকার করেন। তার ফলে পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় সারা ভারতে ইংরেজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ সূর্য তখন মধ্য-গগনে।



লর্ড ডালহৌসী

(গ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ঃ

নানাকারণে দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তাদের প্রভাবে ভীত হয়ে খাসী, কোল, ভীল, সন্ন্যাসী, চোয়াড়, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। ওয়াহাবী ও তিতুমীরের বিদ্রোহও ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সারা ভারতে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৭ সালে। ঐ বিদ্রোহের মূলে কতকগুলো কারণ ছিল।

রাজনৈতিক কারণ

অনেকদিন থেকেই ভারতীয় রাজারা বৃটিশের পররাজ্য গ্রাস করার নীতিতে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। শেষে লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করলে তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এজন্য পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার নবাব, সম্রাট বাহাদুর শাহ প্রভৃতি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, ইংরেজদের রাজ্য গ্রাস নীতির ফলে নবাবের আশ্রিত লোকেরা সুযোগ সুবিধে হারায় ও বেকার হয়ে পড়ে। ফলে ঐসব রাজ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়।

ঐ বিদ্রোহের পেছনে কিছু অর্থনৈতিক কারণও ছিল। জমিদার প্রথায় জনসাধারণের উপর দিন দিন অত্যাচার বাড়তে থাকে। জমিদারগণও ইংরেজদের অত্যাচারে খুশী ছিল না। দেশে কুটির শিল্প বন্ধ হবার ফলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। জমিচ্যুত জমিদারগণও অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

অর্থনৈতিক কারণ



রাণী লক্ষ্মীবাঈ



নানাসাহেব

এ ছাড়াও সিপাহীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারও বিদ্রোহে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গ সিপাহীদের ঘৃণার চোখে দেখা হতো। তাদের বেতন খুব অল্প ছিল। তাদের পদোন্নতির আশাও ছিল না। ধর্মের নিষেধ সত্ত্বেও সাগর পার হয়ে তাদের বিদেশে যুদ্ধ করতে হোত। ঐসব কারণে তারা কয়েকবার ছোটখাট বিদ্রোহ করে। এমন অবস্থায় এনফিল্ড নামক এক নতুন রাইফেল চালু হয়। ঐ রাইফেলের টোটায় নাকি গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো ছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহিগণ জাতিধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে বিদ্রোহ করে।

এনফিল্ড রাইফেল

ধর্মীয় সংস্কারও ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। পাদরীদের দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে জনসাধারণ সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়ে। দেশে টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতি চালু হবার ফলে ঐ আশঙ্কা আরও জোরদার হয়। সমাজ সংস্কারের ফলেও বিরূপ মনোভাব দেখা দেয়।

ধর্মীয় ভীতি

সিপাহিগণ সর্বপ্রথম ১৮৫৭ সালে মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বর পাণ্ডের নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে অযোধ্যা, ঝাঁসি, কানপুর, মীরাট ও বিহার অঞ্চলে। দিল্লীতে বিদ্রোহীরা মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে

বিদ্রোহের বিস্তার

ঘোষণা করে। কুনওয়ার সিং, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রভৃতি ঐ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। জমিদার, কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণও ঐ বিদ্রোহে অংশ নেয়।

প্রকৃতি ঃ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে নানামত চালু আছে। অনেকে ঐ বিদ্রোহকে **সিপাহী বিদ্রোহ** বলে বর্ণনা করেন। কারণ সিপাহীদের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ঐ বিদ্রোহ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যারাকপুর, মীরাট প্রভৃতি অঞ্চলে তারা বিদ্রোহ করে। অনেকে উহাকে **প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম** বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদই ছিল উহার প্রধান লক্ষ্য। উহা অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনের চেহারা নেয়। সম্রাট বাহাদুর শাহ ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার আহ্বান করেছিলেন। কৃষক ও সিপাহিগণ ছিল সাধারণ শ্রেণীর মানুষ।



সম্রাট বাহাদুর শাহ

সারা ভারতে ঐ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিগণ ব্যর্থ হন।

বিফলতার কারণ

প্রথমতঃ, তাদের মধ্যে একতা, দেশপ্রেম ও যোগাযোগের অভাব ছিল। সারা ভারতে নেতৃত্ব দেবার মত ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আগ্রহের অভাব এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে উহা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, যোগাযোগের সুবিধে, বৃটিশ সেনাপতিদের যুদ্ধ কৌশল ও দক্ষতা এবং সামরিক উপকরণ ইংরেজদের সাফল্যের মূল কারণ ছিল।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ঃ

১৭৫৭ সালের পর "বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে" সারাভারতে দেখা দিলে ভারতীয়দের মনে নানা অসন্তোষ দেখা দেয়। উহাদের প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী পর্যন্ত সকলেই ছলে বলে সাম্রাজ্যের প্রসার করেন। চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, মুঘল সম্রাটের ভাতা বন্ধ ও অসম্মান দেশবাসীর মনে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে। লর্ড

ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ভারতের রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। এদিকে জনসাধারণের মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতীয়দের নেটিভ ও কালা আদমী বলে ঘৃণার চোখে দেখা হোত। তাদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হোত না। ভারতীয় পুলিশদের কোন মর্যাদা ছিল না। ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার করে টাকা রোজগার জনসাধারণের মনে ঘৃণার ভাগ সঞ্চার করে। শাসন ব্যবস্থায় বিদেশী রীতিনীতি চালু হয়। চোয়াড়, কোল, সাঁওতাল, পাইক ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছোট-খাট বিদ্রোহ করে। কিন্তু সবশেষে রাজনৈতিক অসন্তোষ মহাবিদ্রোহের রূপ নেয়। তবে ইংরেজ আমলে ভারতের অখণ্ডতা জোরদার হয়।

রাজনৈতিক ফলাফল

ইংরেজ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। পূর্বে গ্রাম ছিল স্বনির্ভর ও কৃষিভিত্তিক। গ্রামবাসিগণ সরল শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। ইংরেজগণ ক্ষমতায় আসার পর সব কিছুর পরিবর্তন হয়। স্বনির্ভর গ্রাম গেল। পঞ্চায়েতের স্বাধীনতা নষ্ট হোল। জমির উপর কৃষকের অধিকার চলে গেল। রাজাও চলে গেল। তার বদলে এলো ইংরেজ। এলো অত্যাচারী ও অর্থলোভী রাজকর্মচারী। তারা সরকার ও নিজেদের জন্যে কৃষকদের উপর চালাল অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ। নির্দিষ্ট হারে টাকায় খাজনা দেবার রীতি চালু হওয়ায় কৃষকগণ মহাজনের নিকট জমি বন্দক দিতে বাধ্য হয়। খাজনা ঠিকমত আদায়ের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। কিন্তু জমিদারগণ জমির কোন উন্নতি করে নাই। কৃষকদের উপর জুলুম করে তারা টাকা আদায় করত এবং শহরে বিলাসিতার মধ্যে বাস করত। দেশের সর্বত্র কৃষকদের উপর অত্যাচার করা হোত। ফলে মাঝে মাঝে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিত।

অর্থনৈতিক ফলাফল

শিল্প ও বাণিজ্য ঃ

শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের চা, তাঁতের কাপড়, মসলিন ও সিল্ক, মশলা, চিনি, হাতের কাজের জিনিস প্রভৃতি দেশ বিদেশে রপ্তানি হোত। গ্রামের কারিগর ও শহরের অভিজ্ঞ শিল্পীরা ঐ সব কাজ করত। দেশে বড় বড় শহর ও বন্দর গড়ে ওঠে। কিন্তু ইংরেজদের শাসন কায়েম হবার সঙ্গে অবস্থার অবনতি ঘটে। সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অত্যাচারে কারিগররা টিকে থাকতে পারল না। পরে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তা নানা ধরনের সূতী ও অন্যান্য জিনিসপত্র এদেশে আসতে থাকে। প্রতিযোগিতায় তারা এঁটে উঠতে পারে নাই। সরকার ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখায় নাই। বরং তাদের জিনিসপত্র বাইরে গেলে রপ্তানি শুল্ক দিতে হোত। এভাবে ভারতের কুটীরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয় এবং ভারত সব দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দেশে বেকারত্ব চরমে উঠে। ফলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রসার ও লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস/লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলী/লর্ড ডালহৌসির ভূমিকা (জ্ঞান-প্রয়োগ)
- ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক/সামাজিক/ধর্মীয় কারণ আলোচনা কর। (জ্ঞান-বোধ)
- বিদ্রোহের বিফলতার কারণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। (জ্ঞান-বোধ)
- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলা যায় কি না প্রমাণ কর। (প্রয়োগমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- 'দ্বৈত শাসন' কি? (জ্ঞানমূলক)
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)
- অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কি? (জ্ঞানমূলক)
- এনফিল্ড রাইফেল কি? (জ্ঞানমূলক)
- বক্সার পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (বোধমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১) 'দ্বৈতশাসনের' মূল কথা ছিল—
ইংরেজদের হাতে থাকবে দায়িত্বহীন ক্ষমতা/নবারের হাতে থাকবে প্রকৃত ক্ষমতা/লর্ড ক্লাইভ হবেন ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী/ভারতবর্ষ বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধীন।

২) 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' প্রথম মেনে নেয়—মহীশূর রাজ্য/মারাঠা রাজ্য/নিজাম/কর্ণাটক রাজ্য।

৩) ব্যারাকপুরের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন—
মঙ্গল পাণ্ডে/রাণী লক্ষ্মীবাঈ/নানাসাহেব/বেগম হজরত মহল।

৪) ইংরেজ আমলে ভারতীয় অর্থনীতির যে অবস্থা হয়েছিল তা হোল—
স্বনির্ভর কুটির শিল্প ধ্বংস/ভারতীয় শিল্পের বিকাশ/ভারতীয় বাণিজ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি/দেশীয় রাজদের অবস্থার উন্নতি। (বোধমূলক)

৫) 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে' কথাটির অন্যতম তাৎপর্য হোল—
নবাবদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল/দেশীয় রাজদের স্বাধীনতা ফিরে এল/নিজামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল/মারাঠাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হোল। (প্রয়োগমূলক)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- সিরাজের রাজধানী কোথায় ছিল?
- পলাশীর যুদ্ধ কবে ঘটেছিল?
- মীরকাশিম শেষ কোন যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন?

- ইংরেজরা কোন সালে দেওয়ানী লাভ করেন?
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?
- লর্ড ওয়েলসলী কোন মহীশূরনেতাকে পরাস্ত করেন?
- হায়দার আলী কোন দেশের শাসক ছিলেন?
- শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?
- রানী লক্ষ্মীবাঈ/নানাসাহেব বিখ্যাত কেন? (বোধমূলক)
- কোথায় প্রথম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ঘটে?
- অযোধ্যার কোন্ মহিলা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন?

—

৮

অষ্টাদশ শতাব্দী বিপ্লবের যুগ

সূচনা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে বিপ্লবের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঐ যুগে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামন্ত প্রথা ও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মনীষীগণ সর্বত্র সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেযুগের মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে।

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ

আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের দেশসমূহ সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইংল্যাণ্ডের স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেই আমেরিকার পূর্ব-উপকূলের ভার্জিনিয়ায় প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ভাবে আরও বারটি উপনিবেশ স্থাপিত হলে উত্তর আমেরিকায় মোট তেরটি ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

উপনিবেশের বেশিরভাগ লোক ছিলেন ইংরেজ। ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা ও প্রচলিত আইনের সাহায্যে তারা শাসন চালাতেন। জনপ্রতিনিধি সভা ছিল তাদের কাছে বৃটিশ পার্লামেন্টের মত। ঐ সভা উপনিবেশের জন্য আইন পাশ ও কর ধার্য করত। প্রতি উপনিবেশে একজন বৃটিশ সরকারের গভর্ণর থাকলেও এতকাল তারা শাসন ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করতেন। অধিবাসীগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকে মুক্তির আশায় ঐ দেশে চলে আসেন। তারা বাইরের কোন অত্যাচার অথবা হস্তক্ষেপ সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং ইংল্যাণ্ড যখন তাদের প্রতিনিধি সভার বিনা অনুমতিতে কর ধার্য করে, তখন তারা উহাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। এদিকে উপনিবেশবাসীদের রেড ইণ্ডিয়ান ও ফরাসী ভীতি দূর হয়। এমতবস্থায় ইংল্যাণ্ড তাদের সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন করার চেষ্টা করলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

রাজনৈতিক কারণ

প্রথমদিকে উপনিবেশগুলোর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কিছু কিছু ব্যবসা, তামাক ও তুলার চাষ ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। তবুও ইংল্যাণ্ডকে



তাদের কিছু কিছু কর দিতে হোত। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হলে ইংল্যাণ্ড নিজ স্বার্থের জন্যে উপনিবেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করে। ১৬৬০ সালে **নৌ-আইন** পাশ হয়। ঐ আইনে উপনিবেশগুলোর ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা ও বৃটিশ জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠাও বন্ধ করা হয়। এজন্যে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তারাও গোপনে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। কিন্তু তৃতীয় জর্জ ঐ নৌ-আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করলে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঠিক ঐ অবস্থায় উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে **স্ট্যাম্প**

অর্থনৈতিক কারণ

আইন। যুদ্ধের ফলে অর্থাভাব ও সৈন্যদের ভরণ-পোষণের অজুহাতে ইংল্যাণ্ড তাদের উপর ঐ (১৭৬৫) কর জারী করে। ঐ আইনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও যে কোন দলিলের উপর স্ট্যাম্প ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে নানাস্থানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। নিউইয়র্কে নয়টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন যে, আমেরিকা ঐ কর দিতে বাধ্য নয় এবং যেহেতু তাদের প্রতিনিধি পার্লামেন্টে নেই, সেহেতু ঐ কর সম্পূর্ণ বেআইনী। অবস্থার চাপে পার্লামেন্ট স্ট্যাম্প আইন বাতিল করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড জোর করে 'ঘোষণামূলক আইন' পাশ ও আমদানী করা চা, চিনি, কাঁচ ও কাগজের উপর কর ধার্য করে। ফলে নানাস্থানে আরও গোলযোগ দেখা দেয়। তৃতীয় জর্জ তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। বোস্টনে প্রচণ্ড হাঙ্গামা হয়। সৈন্যরা কিছু বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে। পার্লামেণ্টে চ্যাথাম, এডমণ্ড বার্ক, ফক্স প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সরকারের নীতির প্রতিবাদ করেন। জনমতের চাপে সরকার সমস্ত কর ও শুল্ক তুলে দেন কিন্তু চায়ের উপর শুল্ক বজায় রাখেন। উত্তেজনা আরও বেড়ে চলে। ঠিক ঐ সময় বোস্টন বন্দরে চা বোঝাই বৃটিশ জাহাজ এসে পৌঁছলে কিছু সংখ্যক বিক্ষোভকারী ছদ্মবেশে বাক্স বোঝাই চা সমুদ্রে ফেলে দেয়। ইতিহাসে ঐ ঘটনাকে '**বোস্টন টি পার্টি** বলা হয় (১৭৭৩)। উহার প্রতিবাদে সরকার ঐ বন্দর বন্ধ করে দেন এবং ম্যাসাচুসেট্স-এর স্বায়ত্তশাসন অধিকার কেড়ে নেন।

বোস্টন টি পার্টি

ঐ জটিল অবস্থায় বারটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়ায় মিলিত হন। তাঁরা এক জোটে সমস্ত প্রকার কর তুলে নিতে ও তাদের মতামত ছাড়া কোন কর ও শুল্ক না বসাতে পার্লামেন্টকে অনুরোধ করেন। সম্রাট তৃতীয় জর্জ তাঁদের ঐ আচরণকে বিদ্রোহ বলে মনে করেন এবং উহাদের দমনের নির্দেশ দেন। ফলে ১৭৭৫ সালে লেক্সিংটনে দু'পক্ষ যুদ্ধ বাধে ও ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয়। ঐ সময় দেশে টমাস পেইনের পত্রিকা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। ঐ পরিস্থিতিতে ফিলাডেলফিয়ায় তৃতীয় কংগ্রেস বসে (১৭৭৬) এবং উহা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ঐ ঘোষণাপত্রটি টমাস জেফারসন রচনা করেছিলেন।

ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস ১৭৭৪-১৭৭৬



জর্জ ওয়াশিংটন

ইতিমধ্যে **জর্জ ওয়াশিংটনের** নেতৃত্বে উপনিবেশবাসীগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে রাশিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড আমেরিকাকে নানা ভাবে সাহায্য করে। ফলে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয় এবং ১৭৮৩ সালে ভের্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

প্রথমতঃ, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০০০ মাইল। এত দূরে থাকার ফলে ঠিক সময় যোগাযোগ রক্ষা ও সৈন্য পাঠানো ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অন্যদিকে, নিজেদের দেশের যুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের প্রচুর সুবিধে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ সেনাপতিদের ঐ দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভুলত্রুটি ও ভাড়াটে সৈন্যের ব্যবহার উপনিবেশবাসীদের সুবিধে করে। দেশরক্ষায় তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। জর্জ ওয়াশিংটনের যোগ্য নেতৃত্ব ও রণকৌশল তাদের জয়লাভে সাহায্য করে। ইংল্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দের সমর্থন ও ইউরোপের দেশসমূহের সাহায্যের ফলে তাদের স্বাধীনতা লাভ আরও সহজ হয়।

সাফল্যের কারণ

আমেরিকায় পৃথিবীতে প্রথম বংশগত রাজতন্ত্র ও অভিজাতহীন গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ বিপ্লবের আদর্শ পরবর্তী কালের ফরাসী বিপ্লব ও দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করে। এছাড়া, ঐ দেশে গণতন্ত্রের যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়, তার প্রভাব নানাদেশে লক্ষ্য করা যায়।

ফলাফল

(খ) "ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব"

শিল্প বিপ্লব ঃ মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মানুষের চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে যায়। ফলে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এভাবে দৈহিক শ্রমের বদলে যে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং আদিম কৃষি ও কুটীর শিল্পের স্থানে শক্তি ও যন্ত্রচালিত কৃষি ও বৃহদকার শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উহাকে শিল্প বিপ্লব বলা হয়। ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে ১৭৫০ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে কৃষি, শিল্প উৎপাদন ও জীবনযাত্রার যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিল্প বিপ্লব বলে থাকেন। শিল্প বিপ্লবে হঠাৎ পরিবর্তন আসেনি। এখনও পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব শেষ হয় নাই।

কৃষি ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের কৃষি ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটে। ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রথা ও ভূমিদান ব্যবস্থা লোপ পায়। জমির মালিকদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। পার্লামেন্ট তাদের সুবিধে মত কৃষিক্ষেত্রে নানা আইন পাশ করে। ঐ সময় ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। ফলে খাদ্যজাত কাঁচামালের দারুণ চাহিদা দেখা দেয়। ধনী জোতদারগণ ঐ চাহিদা মেটাতে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের দিকে নজর দেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য টাকা খাটাতে আরম্ভ করেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। শস্যের বীজ এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে চাষ করার পরিবর্তে **জেথ্রো** লাইন করে বীজ রোপণের

কৃষিতে বিপ্লব

পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ফলে ঘাস ঝাড়াই ও আবাদ করা সহজ হয়। **মিঃ টাউনসেণ্ড** প্রতি চার বছর অন্তর শস্য পরিবর্তন করে চাষ করার পদ্ধতি ও জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু করেন। দেশের সব জমি প্রতি বছর চাষ করা সম্ভব হয় এবং ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এ দিকে অধিক খাদ্য উৎপন্ন করার জন্যে শক্তিশালী বলদ ও গরুর প্রয়োজন হয়। **রবার্ট বেকওয়েল** উন্নত পশু পালন ব্যবহার প্রবর্তন করেন। আর্থার ইয়াং তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ঘেরা বড় বড় কৃষি খামারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। পার্লামেন্টও ঐ উদ্দেশ্যে আইন পাশ করে। ফলে সাধারণের গো-চারণ ভূমি ও খোলা মাঠের জমি ঘিরে বড় বড় ক্ষেত-খামার গড়ে ওঠে। ফলে উন্নত ধরনের চাষ সম্ভব হয়। চাষের কাজে ট্রাক্টর, সীড ড্রেসার, ডাস্টার, স্প্রেয়ার, হুইল-হো প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। জলসেচের জন্য শক্তিচালিত যন্ত্র চালু হয়। এভাবে কৃষি জগতে বিপ্লব আসে।

শিল্পে বিপ্লব

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। ঐ দেশে শিল্প বিপ্লবের উপযোগী শ্রমিক, কাঁচামাল, মূলধন, বাজার, খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণের অভাব ছিল না। সরকারী উৎসাহ ও শিল্প কৌশল দক্ষতা ঐ বিপ্লবকে আরও সহজ করে তোলে।

কার্পাস শিল্প ঃ কার্পাস শিল্পে সর্বপ্রথম বিপ্লবের প্রভাব দেখা দেয়। জন কে ফ্লাইং সাট্‌ল যন্ত্র আবিষ্কার করে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বস্ত্র বয়ন সম্ভব করেন। জেমস হারগ্রীভ্‌সের 'স্পিনিং জেনি" সুতোকাটা দ্রুত ও সহজ করে। আর্কারাইটের ওয়াটার-ফ্রেম নামে জল চালিত যন্ত্র, স্যামুয়েল ক্রমটনের 'মুসলিন হুইল' সস্তায় ও কম সময়ে সূক্ষ্ম কাপড় বোনার জন্যে আরও উন্নত ও শক্ত সুতো তৈরি করতে সাহায্য করে। চাহিদা পূরণের জন্যে প্রচুর তুলো ঝাড়াই ও অল্প সময়ে প্রচুর উৎপাদন প্রয়োজন হয়। কার্টরাইটের শক্তিচালিত তাঁত ও হুইটনির তুলো থেকে বীজ ছাড়াবার 'কটন জিন' যন্ত্র ঐ অভাব দূর করে। কার্টরাইট শক্তিচালিত তাঁত ও পশম পরিষ্কার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৮৫ সালে বাষ্পচালিত তাঁত চালু হয়। এভাবে কার্পাস শিল্প অতি উন্নত হয়ে ওঠে। পশম পরিষ্কার আবিষ্কারের ফলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে আরও সস্তায় ও সহজে উৎপাদন সম্ভব হয়। তার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড কার্পাস, পশম, সিল্ক ও অন্যান্য বয়ন শিল্পে প্রধান আসন অধিকার করে।

জেমস ওয়াট ১৭৬৯ সালে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। তার ফলে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়। বাষ্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হবার ফলে যন্ত্রপাতির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। সহজে লোহা গলাবার পদ্ধতি জানা ছিল না।

আব্রাহাম কয়লার সাহায্যে লোহা গালাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ঐ অভাব দূর করেন। স্মীটন লোহা গলানোর চুল্লী আবিষ্কার করলে লোহা ও ইস্পাত শিল্পে উন্নতি হয়। এরপর নিম্নমানের লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করার কৌশলও আয়ত্ত হয়। সস্তায় ইস্পাত রপ্তানির ফলে ঐ শিল্পের প্রসার ঘটে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারে শিল্প বিপ্লব আরও উন্নত হয়।

লৌহ শিল্প

নানা ধরনের কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য কয়লার যোগান অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল। কিন্তু কয়লা খনিতে কাজ করা তখন খুব সহজ ছিল না। হামফ্রে ডেভি খনির ভিতরে কাজ করার জন্য এক ধরনের নিরাপদ বাতির প্রচলন করেন। কয়লার সংগ্রহ এ ভাবে সহজ হবার ফলে লোহা ও ইস্পাত শিল্প উন্নতি লাভ করে। এ ছাড়া, খাল খনন ও জাহাজ নির্মাণ দেশ-বিদেশের মাল আমদানী ও রপ্তানিতে যুগান্তর আনে।

কয়লা শিল্প

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ঃ শিল্প বিপ্লব সভ্যতার ইতিহাসে নানা প্রভাব বিস্তার করেছে। উহার ফলে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

প্রথমতঃ, কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে প্রচুর উৎপাদন সম্ভব হয় ও নানা উন্নতি হয়। দ্বিতীয়তঃ, খোলা মাঠের স্থানে ঘেরা বড় বড় খামার গড়ে ওঠায় সাধারণ চাষী তাদের জমি হারায়। তারা শহরে ভিড় করে। কুটীর শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নানা বস্তি ও নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে লণ্ডন, বার্মিংহাম ও ম্যাঞ্চেষ্টার ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধনী খামারের মালিকদের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কৃষি

শিল্প বিপ্লব ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তন আনে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশে পুঁজিপতিরা বহু ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করে। লোহা, কয়লা ও বস্ত্র উৎপাদন তিনশ গুণ বৃদ্ধি পায়। তার রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দশগুণ বেড়ে যায়। সারা দেশ বিরাট কারখানায় পরিণত হয়। ফলে ইংল্যাণ্ড সারা ইউরোপে নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করে এবং লণ্ডন পৃথিবীর বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুরাতন কুটীর ও তাঁত শিল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লোকেরা অনাহার এবং অনিদ্রার শিকার হয়। বহু লোক বেকার হয়ে পড়েএবং যন্ত্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। তৃতীয়তঃ, খনি ও শিল্পে নারী ও শিশুদের নিয়োগ আরম্ভ হয়। তাদের উপর নানা নির্যাতন শুরু হয়। শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা ধরনের অসামাজিক অপরাধের সূত্রপাত হয়। ঐসব সমাধানে সরকারকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক

(গ) ফরাসী বিপ্লব ঃ

বিপ্লবী চিন্তাধারা ঃ ফরাসী বিপ্লব একদিনে ঘটেনি। বাইরের প্রভাব ও দার্শনিকদের রচনা জনসাধারণকে বিপ্লবী করে তোলে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে বিপ্লবের হাওয়া বইতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঘটে গৌরবময় বিপ্লব। আমেরিকায় ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমেরিকার দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের প্যারিসে বসবাস জনসাধারণের উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলে। ফ্রান্সের দার্শনিকগণ ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হন। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁরা শক্তিশালী রচনার মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন ও দেশে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করেন। ঐ মনীষীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন মন্টেস্কু, ভলটেয়ার ও জাঁ জ্যাক রুশো।

মন্টেস্কু
১৬৮৫-১৭৫০

মন্টেস্কু দেশের স্বৈরচারী রাজতন্ত্র ও চার্চের অন্যায় অবিচারের তীব্র নিন্দা করেন। 'দি ইস্পিরিট অব দি লজ' নামক গ্রন্থে তিনি ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাদের অধিকার রক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। এছাড়া, রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্যে তিনি শাসন, আইন ও বিচারবিভাগকে পৃথক করার প্রস্তাব দেন।

ভলটেয়ার
১৬৯৪-১৭৭৮

বিপ্লবের আদর্শকে ভলটেয়ার আরও কিছুটা এগিয়ে দেন। তিনি ছিলেন সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ও দার্শনিক। তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে দেশের চার্চ ও পাদরীদের সমালোচনা করেন। তাঁর প্রভাবে ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং রাজতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়।

জাঁ জ্যাক রুশো
১৭১২-৭৮

যিনি ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানেন তিনি হলেন **জাঁ জ্যাক রুশো**। জেনেভায় এক ঘড়ি নির্মাতার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন "মানুষ সর্বত্র স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাকে সর্বত্র শৃঙ্খলিত করা হয়েছে।" তিনি শাসন ও ধর্ম ব্যবস্থাকে মানুষের দুর্দশার কারণ বলে বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর রচিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract) দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, মানুষ নিজেদের অধিকার রক্ষায় নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাজার সৃষ্টি করে। সাধারণের ইচ্ছাই ক্ষমতার একমাত্র উৎস। রাজার কর্তব্য হল চুক্তি মত জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও অধিকার রক্ষা করা। বতর্মানে ফ্রান্সের জনসাধারণ তাদের অধিকার হারিয়েছে; সুতরাং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে জনসাধারণের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত।

বিপ্লবের কারণ ঃ এভাবে ফ্রান্সের জনসাধারণ বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়।



ভলটেয়ার



রুশো

কারণগুলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মোট তিনভাগে ভাগ করা যায়।

সামাজিক বৈষম্য ঃ ঐ সময় ফরাসী সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম স্তরে ছিল যাজক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় স্তরে অভিজাত এবং তৃতীয় স্তরে ছিল ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের জনসাধারণ সরকারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত এবং বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করত। অন্যদিকে, দেশের শতকরা ৯৬ ভাগ লোক বঞ্চিত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের কোন সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ছিল না। অপেক্ষাকৃত ধনী ও উন্নত মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক শ্রেণী ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। ফলে তারা মিলিতভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আর্থিক বৈষম্য

সমাজে তিনটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী রাষ্ট্রের সমস্ত সুবিধে ভোগ করা সত্ত্বেও সরকারকে কোন কর দিত না। চার্চ ও রাষ্ট্রের খরচের ৯০ ভাগেরও বেশি কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হত। তাদের বেগার শ্রম দিতে হতো। ষোড়শ লুই দেশের অবস্থা উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্যে কোন কিছু করতে পারেন নাই। অভিজাতদের জনবিরোধী নীতি দেশের মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে। ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপের দরুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় রাজতন্ত্রের শত্রু হয়ে ওঠে। তাদের শোষণের উপর চলত রাজা, অভিজাত ও রাজ পরিবারের বিলাসিতা ও চরম আড়ম্বর।

সম্রাটদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার ফলে অবস্থার অবনতি হয়। জনসাধারণের কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। বিনা বিচারে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হোত।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই ছিলেন বিলাসী ও শাসনের অযোগ্য। তাঁদের আমলে রাজসভা বিলাসিতা ও ব্যভিচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাণীর প্রভাবে অত্যাচার ও শোষণ চরমে ওঠে। এমতাবস্থায় ইংল্যাণ্ডের নিকট বারবার পরাজয়ে ফ্রান্স তার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য হারায়। ফ্রান্সের ঐ অধঃপতনের জন্যে জনসাধারণ রাজতন্ত্রকে দায়ী করে এবং রাজার উচ্ছেদ চায়।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

বিপ্লবের প্রসার ঃ দেশের দুর্দিনে ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তুর্গো, নেকের ও কালন প্রভৃতি যোগ্য সচিবদের নিয়োগ করে অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কিছুই করে উঠতে পারেন নি। ঐ সময় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে টাকা মঞ্জুরীর জন্যে সম্রাট বাধ্য হয়ে **স্টেট্‌স্ জেনারেলের** সভা ডাকতে বাধ্য হন (১৭৮৮)। ১৭৪ বছর পরে ঐ সভার অধিবেশন বসে। কিন্তু সাধারণ সভ্যগণ মাথা পিছু ভোটাধিকার দাবী করলে অভিজাত ও যাজক শ্রেণী উহাতে রাজী হলেন না। ফলে সাধারণ সভ্যগণ নিজেদের ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বলে ঘোষণা করেন এবং বৈঠকে যোগ দিতে চেষ্টা করেন। সভাকক্ষ বন্ধ দেখে তাঁরা পার্শ্ববর্তী টেনিস মাঠে জাতীয় সংবিধান রচনার শপথ নেন। উহাকে বলা হয় **'টেনিস কোর্টের শপথ'**। সম্রাট মাথাপিছু ভোটাধিকার মেনে নেন। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে প্যারিসে ক্ষুধার্ত নরনারী ভিড় করে। সেখানে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিকে সম্রাট জাতীয় পরিষদকে ভয় দেখানোর জন্যে সৈন্য মোতায়েন করলে গোলযোগ দেখা দেয়। উন্মত্ত জনসাধারণ কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে এবং হাজার হাজার রাজতন্ত্র বিরোধী বন্দীকে মুক্তি দেয়। বাস্তিলের পতনে (১৭৮৯, ১৪ জুলাই) রাজতন্ত্রের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। ঐ দিন স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। সর্বত্র বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। অভিজাত ও যাজকদের উপর শুরু হয় অত্যাচার। বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় বিপ্লবী সৈন্য ও রাজকর্মচারীরা। এদিকে উন্মত্ত ও ক্ষুধার্ত জনতা ভের্সাই আক্রমণ করে রাজা ও রাণীকে বন্দী করে প্যারিসে নিয়ে আসে। জাতীয় পরিষদ দেশের সংবিধান রচনা করেন। উহাতে সকলের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়। সম্রাট, অভিজাত ও যাজক শ্রেণী ঐ অবস্থায় বাইরের সাহায্য নিয়ে তাদের দমন করার চেষ্টা করেন। রাজা ও রাণী ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁদের ধরে ফেলে। ইতিমধ্যে দেশে চরমপন্থী **জ্যাকোবিন** দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এদিকে রাজতন্ত্র রক্ষায় অস্ট্রিয়া

স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান

বাস্তিলের পতন

ও প্রাশিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে। রাজা ও রাণী বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত রাজা ও



ষোড়শ লুই



রবস্‌পিয়ের্

রাণীকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা সমিতি গঠিত হয় এবং বিপ্লব বিরোধী ও জ্যাকোবিন বিরোধীদের হত্যা করা হয়। প্রায় এক বছর ধরে রবস্‌পিয়েরের নেতৃত্বে চলে **'সন্ত্রাসের রাজত্ব'** (১৭৯৩-৯৪)। প্রায় সতের হাজার লোকের জীবননাশ হয়। শেষে রবস্‌পিয়ের্ও নিহত হন। দেশ শাসনের জন্য পাঁচজনের ডাইরেক্টরী সমিতি গঠিত হয়। তাঁরা নেপোলিয়নের সাহায্যে প্যারিসে রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ দমন করেন।

সন্ত্রাসের রাজত্ব

(খ) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) ঃ

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কার্সিকা দ্বীপে ১৭৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে থেকে তিনি ফ্রান্সের অধীন নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা কল্পনা করতেন। কিন্তু ফ্রান্স কার্সিকাকে সমান অধিকার দেওয়ায় তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পরে তিনি জ্যাকোবিনদের প্রভাবে আকৃষ্ট হন ও তাদের পতনে বন্দী হন। ইতিমধ্যে তিনি তুলো বন্দরে ইংরেজ নৌ-আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হন। পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন ও ডাইরেক্টরীর নির্দেশে প্যারিসে রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ইতালী অভিযান করেন এবং রোমসহ বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করেন। নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা চরম বৃদ্ধি পায়। তিনি মিশর দখল করেন এবং বৃটিশ, রুশ, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে সময় ফ্রান্সে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি জনমতের চাপে ডাইরেক্টরীকে ক্ষমতাচ্যুত করে 'কনসালেট' গঠন করেন এবং প্রধান কনসালরূপে শাসন চালান

বিপ্লবের সৈনিক নেপোলিয়ন

প্রধান কনসাল

(১৭৯৯)। ঐ সময় তিনি অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি শাসন সংস্কারে মন দেন। গঠিত হয় "নেপোলিয়ন আইনবিধি"। ঐ আইনে সমতা ও সকলের সমান অধিকার নীতি গৃহীত হয়। মুদ্রার সংস্কার, কৃষকদের জমিদান, শিক্ষার উন্নতি, সৈনিকদের উৎসাহ দান প্রভৃতি কার্যসূচী তিনি গ্রহণ করেন। ফলে জনসাধারণের ভোটে তিনি যাবজ্জীবন কন্সালপদে নিযুক্ত হন। ১৮০৪ সালে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

নেপোলিয়ন আইনবিধি

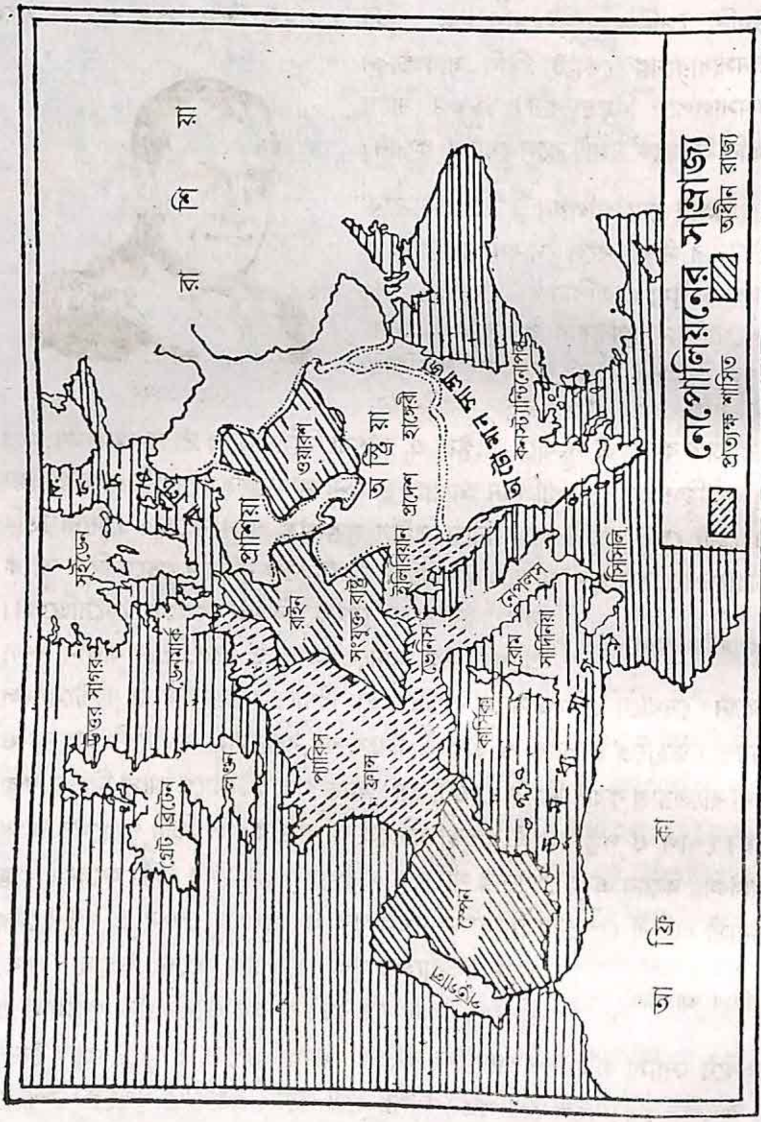


নেপোলিয়ন

সম্রাট নেপোলিয়ন ঃ তিনি নিজেকে ইতালীর সম্রাট বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করেন। কিন্তু পরে ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে। ঐ সংবাদে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া মিলিতভাবে তাঁকে আক্রমণ করে ও পরাজিত হয়। নেপোলিয়ন আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীতে কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ছোট ছোট আটটি রাজ্য নিয়ে **রাইন যুক্তরাষ্ট্র** গঠন করেন। এদিকে তিনি **'মহাদেশীয় ব্যবস্থার'** মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে দিয়ে তাকে সারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। প্রাশিয়া উহা মানতে অসম্মত হলে তিনি বার্লিন দখল করেন। সেখানে ১৮০৬ সালে ঘোষিত হয় বিখ্যাত মহাদেশীয় বা কণ্টিনেণ্টাল ব্যবস্থা। উহাতে ইংল্যাণ্ড ও তার উপনিবেশের বন্দরগামী মালবাহী জাহাজ ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত পণ্য ইউরোপে আসা নিষিদ্ধ করা হয়। পোপ ও পর্তুগাল ঐ ব্যবস্থা মানতে আপত্তি করলে তিনি পোপের রাজ্য অধিকার করেন এবং স্পেনের সাহায্যে পর্তুগাল আক্রমণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরাসী বাহিনী স্পেনের সিংহাসন দখল করলে শুরু হয় স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে উপদ্বীপের যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড তাদের সাহায্য দেয়। ইংল্যাণ্ড সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্তুগাল ও স্পেনে ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়নের ঐ যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য ও অর্থক্ষয় হয়। ফলে তাঁর পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য ঐ যুদ্ধকে 'স্পেনীয় ক্ষত' বলা হয়। অস্ট্রিয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করে ও পরাজিত হয়। এদিকে রাশিয়া মহাদেশীয় ব্যবস্থা মেনে নিতে অসম্মত হলে নেপোলিয়ন প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য

মহাদেশীয় ব্যবস্থা

রাশিয়া আক্রমণ


নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য
প্রত্যক্ষ শাসিত
অধীন রাজ্য
রা শি য়া
সুইডেন
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
গ্রেট ব্রিটেন
লণ্ডন
প্রাশিয়া
ওয়ারশ
অ স্ট্রি য়া
হাঙ্গেরী
রাইন
সংযুক্ত রাষ্ট্র
প্যারিস
ফ্রান্স
স্পেন
পর্তুগাল
ইলিরিয়ান প্রদেশ
ভেনিস
রোম
নেপলস
সার্দিনিয়া
কর্সিকা
সিসিলি
অটোমান সাম্রাজ্য
কনস্ট্যান্টিনোপল
আ ফ্রি কা

নিয়ে রাশিয়া অভিযান করেন এবং মস্কো অধিকার করেন। অগত্যা নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফেরার চেষ্টা করেন। ফেরার পথে প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাবে প্রায় চারলক্ষ সৈন্য মারা পড়ে। এদিকে নেপোলিয়ন দেশে বংশগত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও আত্মীয়-স্বজনদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তিনি জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্র প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তিনি রাজাদের নিয়ম প্রথা চালু করেন। অন্যদিকে, অধীনস্থ জার্মানী, ইতালী ও অস্ট্রিয়ায় নেপোলিয়ন আইনবিধি প্রচলিত হয়। বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ঐ সব দেশের জনসাধারণ।

নেপোলিয়নের পতন

রাশিয়া আক্রমণের ব্যর্থতায় ঐ সব রাজ্য রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। ইংল্যাণ্ডও এগিয়ে আসে। লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হন এবং তাঁর সাম্রাজ্য ও মহাদেশীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে (১৮১৩)। ঐ অবস্থায় নেপোলিয়ন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে মিত্রশক্তির আক্রমণে প্যারিসের পতন ঘটে। নেপোলিয়নকে এলবা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং একশত দিন রাজত্ব করেন। ফলে মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে **ওয়াটারলুর যুদ্ধে** (১৮১৫) মিত্রশক্তি জয়ী হয়। এবার তাঁকে আটলান্টিক মহাসাগরের নির্জন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ছয় বৎসর পর তিনি মারা যান। তাঁর পতনে পুরাতন বুরবোঁ রাজবংশের অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসানো হয়।

ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল ঃ পৃথিবীর পরবর্তী কালের নানা বিপ্লব ও আন্দোলনের উপর ফরাসী বিপ্লব এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ, বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে নীতি রূপে গৃহীত হয়। সামন্ত ও দাসপ্রথার উচ্ছেদ, সকলের সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রভৃতি ধারণা সর্বজনীন দাবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ বিপ্লব ঘোষণা করেছে জনগণই রাষ্ট্রের ভিত্তি। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তিনি ঐ ধারণাকে ধ্বংস করতে পারেন নাই। বরং ইউরোপে প্রজাতন্ত্র আন্দোলন আরও জোরদার হয়। তৃতীয়তঃ, উহা ইউরোপ ও অন্যত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জোরদার করে। এভাবে মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিও চালু হয়। চতুর্থতঃ, ঐ বিপ্লবের ফলে দেশে ধনিক শ্রেণী ক্ষমতালাভ করে এবং কৃষকগণ রাজনৈতিক অধিকার ও জমি লাভ করে। শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি না হওয়ায় ফ্রান্সে শুরু হয় সমাজতন্ত্রের আন্দোলন যার প্রভাব ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনী

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ **(জ্ঞানমূলক)**

- কত সালে ইংরেজরা আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে?
- নৌ আইন কত সালে পাশ হয়?
- স্ট্যাম্প আইন কত সালে জারী হয়?
- ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস কখন বসে?
- টমাস পেনের লেখা পত্রিকার নাম কি?
- কবে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে?
- স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
- ঐ সময় ইংল্যান্ডের সম্রাট কে ছিলেন?
- বিভিন্ন দেশ থেকে লোকেরা আমেরিকায় কেন এসেছিলেন (বোধমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ **(জ্ঞানমূলক)**

- নৌ-আইন কি?
- স্ট্যাম্প আইন কাকে বলে?
- 'বোস্টন টী পার্টি' কি?
- স্ট্যাম্পের কর না দেবার কি যুক্তি ছিল? (বোধমূলক)

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

- স্বাধীনতা বিপ্লবের পূর্বে উপনিবেশবাসীদের কি কি রাজনৈতিক অধিকার ছিল? ঐ অধিকারে হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করে নাই কেন? (জ্ঞান-বোধমূলক)
- নৌ-আইন, স্ট্যাম্প আইন ও বোস্টন টী পার্টি কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করে? (বোধমূলক)
- স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংল্যান্ডের পরাজয় ও উপনিবেশের সাফল্যের কারণ কি? (বোধমূলক)

(খ) শিল্প বিপ্লব ঃ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ **(জ্ঞানমূলক)**

- ফ্লাইং-সাট্‌ল কে আবিষ্কার করেন?
- স্পিনিং জেনি কে আবিষ্কার করেন?
- আর্করাইট কি যন্ত্র তৈরী করেন?

- বাষ্পচালিত তাঁত কবে আবিষ্কৃত হয়?
- লোহা গলানোর চুল্লী কে নির্মাণ করেন?
- খনিতে কাজ করার বাতি কে আবিষ্কার করেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

শিল্প বিপ্লব কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

কৃষিতে কিভাবে বিপ্লব ঘটে? উহার ফল কি হয়? (বোধমূলক)

কার্পাস ও লোহা শিল্পে বিপ্লব ঘটার কারণ কি? উহার কি ফল হয়েছিল?

(জ্ঞান-বোধমূলক)

(গ) ফরাসী বিপ্লব ঃ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- মন্টেস্কিউ রচিত পুস্তকের নাম কি?
- 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' কে প্রচার করেন?
- স্টেট্স্-জেনারেল কত সালে ডাকা হয়?
- বাস্তিল দুর্গের কবে পতন ঘটে?
- সন্ত্রাসের রাজত্ব কতদিন চলে?
- নেপোলিয়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- মহাদেশীয় ব্যবস্থা কবে ঘোষণা করা হয়?
- তাঁকে প্রথম কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয়?
- তিনি শেষ কোন্ যুদ্ধে পরাজিত হন?
- রাজপ্রাসাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছিল কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' কি?
- 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' কাকে বলে?
- 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' কাকে বলে?
- 'স্পেনীয় ক্ষত' কি?
- 'টেনিস কোর্টের শপথ' কেন বিখ্যাত? (বোধমূলক)

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

- মন্টেস্কিউ, ভলটেয়ার ও রুশো কিভাবে বিপ্লবে সাহায্য করেন? (বোধমূলক)
- বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ লিখ। (জ্ঞানমূলক)

- বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ কি? উহার স্থায়ী ফলাফল কি ছিল? (জ্ঞান-বোধমূলক)
- বিপ্লবের সৈনিক ও সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়নের সাফল্য কতখানি? (প্রয়োগমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১) ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশ আমেরিকায় গড়ে তোলেন (জ্ঞানমূলক)

ক) কলম্বাস

খ) ম্যাগেলান

গ) ওয়াল্টার র‍্যালে

ঘ) লর্ড ওয়াশিংটন

২) উত্তর আমেরিকায় মোট উপনিবেশ গড়ে ওঠেছিল

ক) সাতটি

খ) দশটি

ঘ) তেরোটি

ঘ) পঞ্চাশটি।

৩) শিল্প বিপ্লবের অন্যতম ফলাফল ছিল (বোধমূলক)

ক) ভারতের কুটির শিল্প উন্নত হয়

খ) উপনিবেশের শ্রমিকদের অবস্থা উন্নতি লাভ করে

গ) ফ্রান্স শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করে

ঘ) লণ্ডন পৃথিবীর বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পায়।

৪) 'মানুষ সর্বত্র স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলিত'— বলেছেন

ক) মন্টেস্কু/ভলটেয়ার/রুশো/নেপোলিয়ন। (জ্ঞানমূলক)

৫) নেপোলিয়নের স্পেন বিজয়কে 'স্পেনীয় ক্ষত' বলার যুক্তি হোল—

ক) ঐ যুদ্ধ রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (প্রয়োগমূলক)

খ) ঐ যুদ্ধে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্ষমতা হারান

গ) নেপোলিয়ন কোড আইন তুলে নেওয়া হয়

ঘ) স্পেনের পরাজয় তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৯

১৮১৫ সালের পর ইউরোপের ইতিহাস

(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ ঃ ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের আইন সারা ইউরোপে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু তৎকালীন ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ শক্তি ঐ বিপ্লবের বীজকে নষ্ট করে ভিয়েনা সম্মেলনের বৈধ স্বত্ব রক্ষা নীতি ও **মেটারনিক** নীতির সাহায্যে সারা পৃথিবীতে পুলিশী রাজত্ব চালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রগতিবাদীদের সঙ্গে রক্ষণশীল শক্তির সংঘর্ষ দেখা দেয়।

বৈধস্বত্ব রক্ষা

ভিয়েনা সম্মেলনের নীতি অনুসারে নেপোলিয়ন যে সব রাজাদের তাড়িয়ে দেন, বৃহৎ শক্তিগুলো ঐ সব রাজাদের সিংহাসনে বসান। ফলে নেপলস্, সিসিলি ও স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয় বুরবোঁ বংশ। সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় বংশ, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ বংশ এবং জার্মানী ও ইতালিতে অসংখ্য রাজপুত্রকে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ইউরোপে গণতন্ত্র ও উদার শাসনের উচ্ছেদ করে রাজতন্ত্র ও দমনমূলক শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করা হয়।

চতুঃশক্তি মৈত্রীসংঘ

ভিয়েনা সম্মেলনের ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ও ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ও অস্ট্রিয়া একটি মৈত্রী সংঘ গড়ে তোলে। ইতিহাসে উহাকে **চতুঃশক্তি মৈত্রী সংঘ** বলা হয়। অস্ট্রিয়ার চতুর প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন ঐ মৈত্রী সংঘের প্রধান। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁরা চারটি সম্মেলনে মিলিত হন। প্রথম সম্মেলন বসে ১৮১৮ সালে আইলাশ্যাপল্ নামক স্থানে। উহাতে ভিয়েনা সম্মেলনের নীতি যেন পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয় রাশিয়া তার প্রস্তাব করে। ১৮২০ সালে স্পেন পর্তুগাল ও ইতালির নেপলস্ ও পীডমন্টে বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিকের প্রস্তাবে ট্রপো নামক স্থানে তাদের অধিবেশন বসে (১৮২০)। উহাতে ঠিক হয়, স্বাক্ষরকারী দেশগুলো প্রয়োজনে বিপ্লবকে দমন করার জন্যে যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। ব্রিটেন ঐ নীতি গ্রহণ করে নি। কিন্তু তা

সত্ত্বেও তৃতীয় অধিবেশন লাইব্যাকের নির্দেশ অনুসারে অস্ট্রিয়া ইতালির বিদ্রোহ দমন করে। স্পেনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্যে চতুর্থ সম্মেলন বসে ভেরোনা নামক স্থানে ১৮২২ সালে। ফ্রান্স ঐ বিদ্রোহ দমন করে রাজা ফার্ডিনান্ডকে আবার সিংহাসনে বসায়। পর্তুগালের বিদ্রোহে ইংল্যাণ্ড সাহায্য করে। চতুঃশক্তি মৈত্রীসংঘ এভাবে ইউরোপে দমন ও রক্ষণশীল নীতি প্রয়োগ করে। ফলে তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নানা জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থীদের আন্দোলন দেখা দেয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী নেতা। তিনি ১৮০৯ সালে ঐ দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। মধুর ব্যবহার, কূটবুদ্ধি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে তিনি ভিয়েনা সম্মেলন ও চতুঃশক্তি মৈত্রী সংঘে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপে তিনি ছিলেন শক্তিমান নেতা। এ জেন্য ঐ যুগকে বলা হয় মেটারনিক যুগ এবং তিনি যে ব্যবস্থা বা নীতি প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় **মেটারনিকের ব্যবস্থা**। ঐ ব্যবস্থার মূলকথা ছিল বহু ভাষাভাষী ও বহু জাতি নিয়ে গঠিত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শকে

মেটারনিক ব্যবস্থা



মেটারনিক

মেনে নেওয়ার অর্থ ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং তিনি উদারনীতিবাদ ও বিপ্লবী আন্দোলনের ছিলেন প্রধান শত্রু। এক দেশের ঘটনা অন্য দেশে আঘাত করে। ফলে কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিলে অন্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সেই সব বিদ্রোহ দমন করতে হবে। তাঁর কূটনীতির ফলে চতুঃশক্তি সংঘ গঠিত হয়। উহা ইউরোপ ও দঃ আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থীদের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয়। তিনি ইতালিকে ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত করেন। জার্মানীতে কার্লস্‌বার্ড আইন জারী করে রক্ষণশীল ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। দু-দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা হয়।

মেটারনিক যুগের হাওয়াকে বুঝতে পারেন নি। তিনি জোর করে বিপ্লবের বীজকে নষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং বহুকষ্টে প্রায় ৩৩ বছর ধরে ইউরোপে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে তাঁর সাম্রাজ্য ও রাজধানী

ভিয়েনায় আন্দোলন এত তীব্র হয় যে, তিনি ভিয়েনা ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঘটে এবং সারা ইউরোপে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন (১৮১৫-১৮৭১) ঃ

সম্রাট নেপোলিয়নের পতনে বৃহৎ শক্তিবর্গ স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধকে অস্বীকার করে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ও নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে যোগ করে দেয়। ইতালিকে পোপ ও অন্যান্য বিদেশী রাজবংশের মধ্যে ভাগ করে উহাকে ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত করা হয়। জার্মানীতেও অস্ট্রিয়ার প্রভাব স্বীকৃত হয়। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও গ্রীসের জাতীয়তাবাদীকে অবহেলা করা হয়। মেটারনিক উদারনীতিকে আমল দেন নাই। ঐজন্য ঐসব দেশে জনসাধারণ ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে।

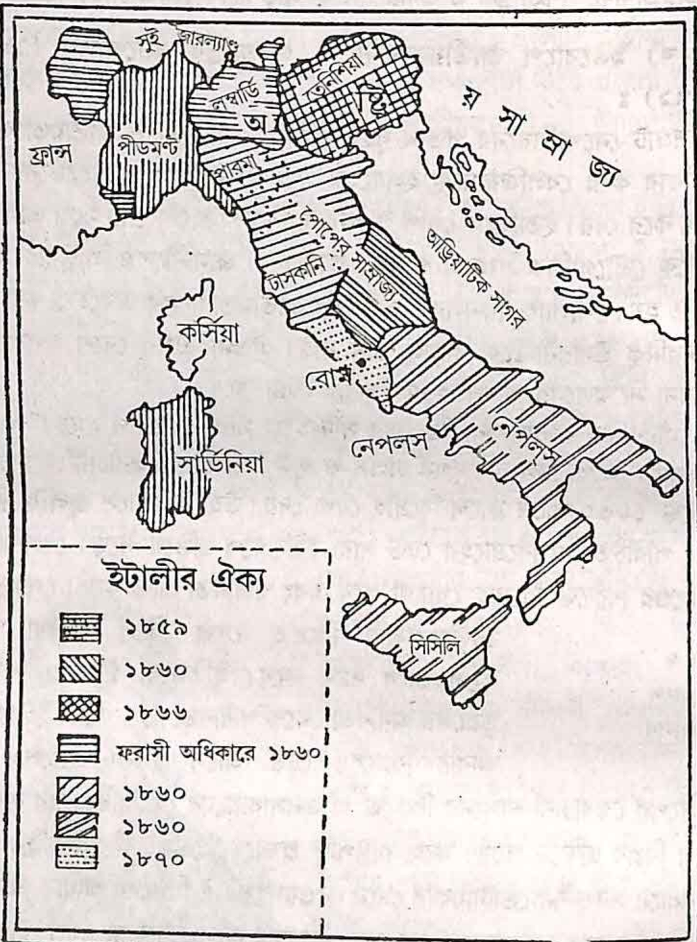
মেটারনিক বলেছিলেন, "ফ্রান্সের সর্দি হলে সারা ইউরোপ হাঁচে।" কথাটি একেবারে মিথ্যে ছিল না। দশম চার্লস ও লুই ফিলিপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উহা ইতিহাসে **জুলাই বিপ্লব** নামে পরিচিত। ঐ বিদ্রোহের ঢেউ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বাধীনতা লাভ করে। পোল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দিলে রাশিয়া উহা কঠোরভাবে দমন করে। ইতিমধ্যে গ্রীস ও সার্বিয়া তুরস্কের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ইউরোপে আবার বিপ্লবের ঢেউ আসে ১৮৪৮ সালে। লুই ফিলিপের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ও জনসাধারণের ভোটাধিকারের দাবীতে দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রপতি প্রজাদের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়। ঐ বিপ্লবের আঘাত জার্মানী, ইতালি ও অন্যত্র প্রবলভাবে দেখা দেয়। বিপ্লবের ফলে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আসে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর উপর। মেটারনিক দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন (১৮৪৮)। হাঙ্গেরী ও চেকদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্রাট মেনে নিতে রাজী হন। ইউরোপীয় সংহতি সংস্থার পতন ঘটে।

ফ্রান্স ও ইউরোপে আন্দোলন

"ইতালির জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন"

মেটারনিক ও ইতালি ঃ নেপোলিয়নের অধীনে থাকাকালীন ঐ দেশে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ মেটারনিকের প্রভাবে ঐ আন্দোলনকে অস্বীকার করে এবং ইতালিকে ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত করে।

সমস্ত ইতালিতে একমাত্র পীডমন্ট ও সার্ডিনিয়া ছাড়া সব রাজ্যের শাসক ছিলেন বিদেশী। সেখানে রাজতন্ত্র কায়েম হয়। সুতরাং প্রথম থেকেই মেটারনিকের

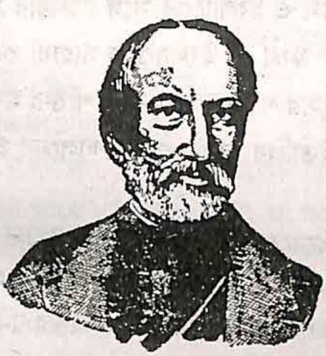


প্রভাব নষ্ট করা এবং স্বদেশীয় পীডমন্ট ও সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য স্থাপন ইতালিবাসীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে দেশে কার্বোনারি ও নানা গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ও নানা বিদ্রোহ ঘটে। পীডমন্ট ও সার্ডিনিয়ার বিদ্রোহ মেটারনিক দমন করেন। জুলাই বিপ্লবের সময় উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় কিন্তু জাতীয়বাদ দেশে প্রসার লাভ করে। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে ইউরোপে ১৮৪৮ সালে বিপ্লব দেখা দিলে ইতালিতেও উহা ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়ায় মেটারনিকের পতন হলে ইতালির লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়ায় বিদ্রোহ শুরু

হয়। পোপ ও কিছু রাজ্য ঐ বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করলে সার্ডিনিয়া তাদের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উহাতে স্বাধীনতা প্রেমিকগণ ঐক্য স্থাপনে সার্ডিনিয়াকে একমাত্র নেতা হিসেবে মেনে নেয়।

মাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদান ঃ মাৎসিনির আদর্শ, কাভুরের কূটনীতি ও গ্যারিবল্ডির সাহস ইতালির ঐক্যস্থাপনকে সম্ভব করে তোলে।

মাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২) ঃ জোনোয়ার অধিবাসী মাৎসিনি বাইশ বৎসর বয়সে কার্বোনারি দলের সদস্য হন। তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় তিনি রোমে প্রজাতন্ত্র সরকার গঠন করেন কিন্তু তা সফল হয়নি। তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হলেও দেশবাসীকে ইতালির অতীত গৌরব সম্বন্ধে সজাগ করে তোলেন। তিনি **'তরুণ ইতালি'** নামে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। তাঁর



মাৎসিনি



কাভুর

আদর্শবাদ তরুণদের মনে দেশপ্রেম বৃদ্ধি করে। তিনি বলতেন, প্রথম রোম সীজারের রোম, দ্বিতীয় রোম পোপেদের এবং তৃতীয় রোম হবে স্বাধীন জনগণের রোম। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অসীম।

কাভুর ঃ কাউন্ট ক্যামিলো কাভুর ছিলেন চতুর কূটনীতিবিদ। তিনি ১৮১০ সালে তুরিণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন বিদেশীদের হাত থেকে ইতালিকে মুক্ত করতে হলে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। প্রথম জীবনে তিনি উগ্র মতবাদের জন্য সামরিক বিভাগ থেকে বিতাড়িত হন এবং পরে সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদদের অন্যতম। রাজতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি ঐ দেশের ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

গ্যারিবল্ডি ঃ মাৎসিনি ও কাভুরের প্রচেষ্টাকে সফলতার দিকে এগিয়ে দেন গ্যারিবল্ডি। ধীবর সন্তান গ্যারিবল্ডি মাৎসিনির তরুণ ইতালি দলে যোগ দেন। তিনিও রাজতন্ত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি দঃ আমেরিকায় গেরিলা যুদ্ধনীতি শিক্ষা করেন এবং দেশের তরুণদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল উদারপন্থী ছিলেন এবং কাভুরের পরামর্শে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।



গ্যারিবল্ডি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও কাভুর (১৮৫৪)

কাউন্ট কাভুর যখন সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী, ঐ সময় বলকান অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইতালি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করে। ফলে ইতালি প্যারিসের শান্তি বৈঠকে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পায়। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও ইতালি

কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে প্লম্‌বিয়েরে একটি গোপন চুক্তি করেন। ঐ চুক্তি অনুসারে কাভুর নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। অস্ট্রিয়া ঐ শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দুপক্ষের মিলিত বাহিনীর নিকট অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় পার্মা, মোডেনা, টাসকানি প্রভৃতি উত্তর ইতালির রাজ্যগুলো সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে কাভুরের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়। এদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু পূর্বসন্ধিমত সার্ডিনিয়া তাঁকে স্যাভয় ও নিশ দিতে রাজী হওয়ায় তিনি আর কোন বাধা দেন নাই।

দঃ ইতালিতে বুরবোঁ রাজারা রাজত্ব করতেন। গ্যারিবল্ডি লালকোর্তা বাহিনীর সাহায্যে সিসিলি ও নেপল্‌স্ জয় করেন। দঃ ইতালি তাঁর অধিকারে আসে। পরে সিসিলি ও নেপলস্ সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এভাবে গ্যারিবল্ডির আত্মত্যাগে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়। কেবলমাত্র ভেনেসিয়া, স্যাভয় ও নিশ তখনও অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের অধীন ছিল।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হলে কাভুর ভেনেসিয়া লাভ করেন। আবার ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় কাভুর স্যাভয় ও নিশ লাভ করেন। এদিকে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল এক অভিযানে পোপের রাজ্য অধিকার করলে ইতালির ঐক্যসাধন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। রোমে রাজধানী স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে সংবিধানের সংস্কারসাধন করে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল কিছু কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার প্রজাদের দান করেন।

জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঃ

বহুধা বিভক্ত জার্মানীতে সম্রাট নেপোলিয়ান ৩৯টি রাষ্ট্র গঠন করে রাইন অঞ্চলের সংযুক্ত রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তাঁর আমলে যে সব সংস্কার সাধিত হয় তার মধ্যদিয়ে দেশে জাতীয়বাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দৃঢ় হয়। প্রাশিয়া এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয়। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে তাঁদের ঐসব আশা নির্মূল হয়। মেটারনিকের প্রভাবে জামনীতে একটি **'শিথিল সংযুক্ত রাষ্ট্র'** গঠন করা হয়। ঐ সব রাজ্যগুলোর বেশীরভাগই ছিল বিদেশী ও অভিজাতদের রাজ্য। তাদের উপর কর্তৃত্ব করত অস্ট্রিয়া। ফলে জার্মানীতে মেটারনিকের প্রভাব খর্বকরতে গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। অধ্যাপক, ছাত্র ও পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। এদিকে প্রাশিয়া প্রথম থেকেই বিদেশী শাসনের হাত থেকে জামনীকে মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করত।

মেটারনিক ও কার্লস্‌বাড় আইন (১৮১৯)

দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্যে মেটারনিক কার্লস্‌বাড় নামক শহরে জার্মান শাসনকদের একটি সভা ডাকেন। ঐ সভায় তিনি জার্মান রাষ্ট্রের সভাপতি হিসাবে কতকগুলো দমনমূলক আইন জারী করেন (১৯১৯)। **'কার্লস্‌বাড় আইনে'** নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা খর্ব করা হয় এবং স্বৈরতন্ত্র পুরোপুরিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৩০ ও ১৮৪৮ সলের বিপ্লব

জুলাই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনসাধারণ ঐসব রাজ্যে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক দাবীও আদায় করে। কিন্তু মেটারনিকের প্রভাবে উহা দমন করা হয়। সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে দেশে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। এদিকে প্রাশিয়া নিজ প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্যে সব সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একধরনের বাণিজ্যশুল্ক রীতির প্রবর্তন করে। উহাকে বলা হয় **জোলভেরিইন শুল্ক চুক্তি**। এভাবে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে ১৮৪৮ সালে মেটোরনিকের পতন

হলে জার্মানীর প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাশিয়ায় উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কোথাও কোথাও জাতীয়তাবাদীদের দাবী মেনে নেওয়া হয়। প্রাশিয়ার রাজা জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে চাইলে সর্বত্র মহা উৎসাহ দেখা দেয়।

এদিকে প্রাশিয়াও ঐ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে নিজশক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রাজা প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হন। তিনি একবছর বাদে (১৮৬২) অটো ফন বিসমার্ককে ঐ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তাঁর ঐ পদে নিয়োগ ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তিনি জার্মানীর ব্রাণ্ডেনবুর্গ নামক স্থানে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিসমার্ক। তিনি রাজার ইচ্ছায় প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যসাধন করতে চেয়েছিলেন। "যুদ্ধ ও অস্ত্রনীতির" দ্বারা তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। জার্মানীর ঐক্যসাধনে তাঁকে ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। ডেনমার্কের অধীন শ্লেজউইগ ও হলস্টিন নামক দুটি স্থানে জার্মান ভাষাভাষীরা বাস করত। জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবীতে তারা আন্দোলন শুরু করে। ফলে ডেনমার্ক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে প্রাশিয়া তাদের সাহায্য করে এবং ডেনমার্ক পরাজিত হয়। ফলে শ্লেজউইগ বিসমার্ক লাভ করেন। ইতিমধ্যে বিসমার্ক ইতালি ও ফ্রান্সকে নিজপক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।



বিসমার্ক

বিসমার্ক
(১৮১৫-১৮৯৮)

ইতিমধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্টিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে জার্মানীতে উহার প্রাধান্য একেবারে লোপ পায়।

হলস্টিন অধিকারভুক্ত হয় ও উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলো প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর জার্মান সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করে দক্ষিণের রাজ্যগুলো গোপনে প্রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হন এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলোকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকেন। অবশেষে স্পেনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে দুপক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হন। উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং

এভাবে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হয়। অবশেষে ১৮৭১ সালে রাজা প্রথম উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট বলে ঘোষিত হন। জার্মানীর ঐক্য স্থাপনে ছিল বিসমার্কের অসাধারণ ভূমিকা। এজন্য তাঁকে জার্মানরাষ্ট্রের **'জনক'** বলা হয়। তবে তিনি উদারপন্থীদের সমর্থন করেন নাই। তাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন।

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ঃ

তোমরা পূর্বেই পড়েছ যে, ১৭৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিকে নানা উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হয়। উহার পেছনে কতকগুলো বিশেষ কারণ ছিল ঃ

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক তারতম্য, শুল্ক ও ক্রীতদাস প্রথা ঃ উত্তরাঞ্চল ছিল শিল্প প্রধান। সেখানে স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন থাকায় ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেওয়া হয়। চাষবাস চলত স্বাধীন কৃষকদের দ্বারা। ঐ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্য বাইরে রপ্তানি হতো এবং তারা বাইরের জিনিস আমদানীর পক্ষপাতী ছিল না। তারা শুল্ক কর ধার্য করার উপর পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণে চলত কার্পাসের চাষ। সেখানে চাষ নির্ভর করত নিগ্রো দাস ব্যবসায়ের উপর। তাছাড়া, দক্ষিণের লোকেরা বাইরে তুলো বিক্রী করত এবং বাইরের জিনিসের অভাবে রপ্তানি করবার পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণের আর্থিক তারতম্য দু অঞ্চলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা ঃ সংবিধানের দুর্বলতা অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। দক্ষিণাঞ্চল সব সময় উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্যকে ঈর্ষা করত। শিল্পে উন্নত হবার ফলে তারা ছিল ধনশালী। আবার জনসংখ্যার দিক থেকে বেশী হবার ফলে শাসন ব্যবস্থায় তাদের কর্তৃত্ব ছিল বেশী। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা তাদের স্বার্থবিরোধী উত্তরের আধিপত্য মেনে নিতে রাজী ছিলনা। এজন্য তারা কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চল কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। সংবিধানে রাজ্যগুলোকে সার্বভৌম অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাদের মতে আরও অতিরিক্ত ক্ষমতা রাজ্যকে দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা যাবে না।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে যখন ঐ ধরনের জটিলতা দেখা দেয় তখন দাসপ্রথা ও আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়লাভ অবস্থার অবনতি ঘটায়। ইতিমধ্যে লেখিকা হেরিয়েট বীচার স্টোর লিখিত **"আঙ্কেল টম্‌স কেবিন"** গ্রন্থ দাসদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ফুটিয়ে তোলে। তার ফলে উত্তেজনা বেড়ে চলে। ঐ সময় ক্যানসাস-নেব্রাস্কা অঞ্চলে ক্রীতদাস সমর্থক ও বিরোধীদের

মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। এদিকে ক্রীতাদাসদের সমর্থনে দেশে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। ঐ দল সারা দেশে ক্রীতদাস বিরোধী প্রচার শুরু করে। উহার অল্পদিনের মধ্যে ১৮৬১ সালে লিঙ্কন ঐ দলের প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তিনি নিজে ছিলেন ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার পক্ষপাতী। তাঁর ধারণা ছিল যে, দাসপ্রথা রদ করলেই যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রক্ষা হবে। সুতরাং ঐ সময় ১৮৬১ সালে দঃ কারোলাইনা রাজ্যের নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলের ছটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে একটি পৃথক সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করে। পরে দুর্গের ভাগাভাগি নিয়ে কেন্দ্র ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে।

ক্রীতদাস প্রথা



আব্রাহাম লিঙ্কন

আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা ঃ তিনি দেশের ঐ দুর্দিনে অসাধারণ সাহস ও মনোবলের পরিচয় দেন। এদিক থেকে সরকারী সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, আর্থিক সঙ্গতি ও জনবল তাঁকে সাহায্য করে। প্রথমদিকে কেন্দ্রের সৈন্য পরাজিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁর বাহিনী জয়লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনের দৃঢ়তার ফলে গৃহযুদ্ধের অবসান হয় এবং দক্ষিণাঞ্চল আত্মসমর্পণ করে। ফলে প্রেসিডেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি আমেরিকার দক্ষিণ অংশে দাসপ্রথার অবসান ঘোষণা করেন। ১৮০৯ সালে কেন্‌টাকির এক গরীব ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পাঁচদিন বাদে এক থিয়েটার হলে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন (১৮৬৫)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জন্মদাতা ও মানব দরদী নেতা হিসেবে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

(ঘ) ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসার-মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ ঃ

ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ধীরে ধীরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ডের তৈরি জিনিস প্রায় সব দেশে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতিগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কলকারখানা স্থাপন করতে থাকে। কিছু কিছু রাষ্ট্র সরঞ্জাম ক্রয় ও ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটে। ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব ঘটে ১৮২৫ সালের

পর। ফ্রান্সের নিকট থেকে লৌহ সমৃদ্ধ আলসাস-লোরেন লাভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানী ইউরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পরে সুইডেন, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া, স্পেন ও অন্যত্র ঐ বিপ্লব ঘটে। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপে যান্ত্রিক সভ্যতা চরমে ওঠে।

ফলাফল

প্রথমতঃ, শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠে। শিল্পপতিরা মিলিতভাবে শিল্প নির্মাণ করার ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রচুর মুনাফা হবার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পাঞ্চলে লোকসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। নানা স্থানে বস্তি গড়ে ওঠে। ঐ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ, শিল্পজাত দ্রব্য মানুষের রুচি, জীবন যাত্রা ও রীতিনীতির দারুণ পরিবর্তন ঘটায়। চুতর্থতঃ, শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। শিশু ও নারী শ্রমিকদের উপর নানা অত্যাচার শুরু হয়। এসবের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চালাতে থাকে। এভাবে **সমাজতন্ত্রের** উদ্ভব হয়।

কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলস্

সমাজতন্ত্রের শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে। রবার্ট ওয়েন উহার উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের জনক হলেন কার্ল মার্কস্ ও তাঁর সহযোগী বন্ধু ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্। কার্ল মার্কস্ ১৮১৮ সালে জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে তিনি রাজনীতি ও সমাজবাদী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং দেশ থেকে বিতাড়িত হন। পরে লণ্ডনে আশ্রয় নেন এবং ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এবং এঙ্গেলস্ উভয়েই শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁদের প্রতি 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা, শ্রেণীসংগ্রাম ও পুঁজিপতিদের শোষণের কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে। তিনি ইতিহাস ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, শোষক ও শোষিতের সংগ্রামই মানব সভ্যতার মূলকথা। ঐ সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী জয়যুক্ত হবে এবং সর্বহারার রাজত্ব কায়েম হবে। প্রথমদিকে ঐ ইস্তাহার খুব জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে উহা সমাজতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি



কার্ল মার্কস্

হিসেবে গৃহীত হয়। মার্কস্ ঐ তত্ত্বকে তাঁর **'ডাশ ক্যাপিটাল'** গ্রন্থে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে সমাজতান্ত্রিক ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ কোটি কোটি শ্রমিক ও শোষিত শ্রেণীর পরিত্রাণদাতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- চতুঃশক্তি সম্মেলন ও মেটারনিক ব্যবস্থা কিভাবে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল? (বোধমূলক)
- ইতালির জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির ভূমিকা আলোচনা কর। (বোধমূলক)
- কাভুর কিভাবে ইতালির ঐক্যসাধনে সাহায্য করেন? (ঐ)
- বিসমার্ক কিভাবে জামনীতে ঐক্য স্থাপন করেন? (ঐ)
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রধান প্রধান কারণ কি? (জ্ঞানমূলক)
- আব্রাহাম লিঙ্কনের গৃহযুদ্ধ দমনে কি ভূমিকা ছিল? (বোধমূলক)
- শিল্প বিপ্লব কিভাবে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে? উহার ফলাফল কি? (ঐ)
- সাম্যবাদের প্রসারে মার্কস্ ও এঙ্গেলসে্র অবদান কোথায়? (প্রয়োগমূলক)

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- বৈধ স্বত্ব রক্ষা নীতি কি? ● মেটারনিক ব্যবস্থা কাকে বলে?
- কার্লস্‌বাড আইন কাকে বলে? ● 'রক্তপাত ও অস্ত্র' নীতি কি?
- 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারের' মূল বক্তব্য কি ছিল? ● উত্তরাঞ্চলের কি বক্তব্য ছিল?
- শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মূল্য কোথায়? (বোধমূলক)

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- চতুঃশক্তি সম্মেলনে প্রধান কে ছিলেন? ● গ্যারিবল্ডির বাহিনীর নাম কি?
- কার্লস্‌বাড আইন কত সালে জারী হয়? ● ফ্রান্স কোথায় প্রাশিয়ার হাতে পরাস্ত হয়?
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ কবে ঘটে?
- লিঙ্কনকে আমেরিকার নতুন জন্মদাতা কেন বলা হয়? (বোধমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক) ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— (জ্ঞানমূলক)
১৮১৫ সালে/১৮৩০ সালে/১৮৪৮ সালে/১৮৭০ সালে।

খ) ইতালিকে 'ভৌগোলিক সংজ্ঞায়' পরিণত করেন
জর্জ ওয়াশিংটন/ নেপোলিয়ন/রুশো/ মেটারনিক।

গ) মাৎসিনির বিপ্লবী দলের নাম
লালকোর্তা বাহিনী/বলশেভিক দল/তরুণ ইতালি/জ্যাকোবিন।

ঘ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিল
নিউইয়র্ক/কানাডা/ফিলাডেলফিয়া/দঃ ক্যারোলাইনা।

ঙ) শিল্প বিপ্লবের অন্যতম ফলাফল হোল (বোধমূলক)
সমাজতন্ত্রের উদ্ভব/গণতন্ত্রের প্রসার/পরিবেশ উন্নতি/ধনী শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস।

১০

চীন ও জাপানের ইতিহাস

ক. চীনে পাশ্চাত্যের চাপ

ভূমিকা ঃ চীন সাম্রাজ্য প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। বাইরের জিনিসের প্রায় প্রয়োজন হোত না। মাঞ্চু সম্রাটগণ নিজেদের সবচেয়ে সুসভ্য বলে মনে করতেন এবং বিদেশী প্রভাব থেকে চীনকে দূরে রেখেছিলেন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চীন আগমন ঃ উনিশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ চাপ সৃষ্টি করার ফলে পশ্চিমের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পর্তুগীজদের (১৫৫৭) পথ অনুসরণ করে স্পেন, ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা চীনে আসে। সে সময় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল দক্ষিণে ম্যাকাও ও ক্যাণ্টন বন্দর।

প্রথম দিকে চীনে জিনিসের আমদানি কম ও রপ্তানি বেশী হবার ফলে বিদেশীদের কাছে ব্যবসা লাভজনক ছিল না। তাছাড়া, কো-হঙ নামক রাজকর্মচারীদের অত্যাচারও কম ছিল না। ফলে ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধের জন্যে সরকারের উপর চাপ দেয়। কিন্তু নানাভাবে ব্যর্থ হবার পর তারা আফিম আমদানি করতে শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যে চীনে আফিম ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে এবং হাজার হাজার মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যায়। সুতরাং সরকার কঠোরভাবে আফিমের ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ঐ উদ্দেশ্যে লিন নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ক্যাণ্টনে ইংরেজদের প্রচুর আফিম নষ্ট করে দেন। চীন ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে শুরু হয় **আফিমের যুদ্ধ**। তিন বছর ঐ যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত রাজধানী পিকিংয়ের অবস্থা বিপন্ন হয়। অগত্যা চীন **নানকিংয়ের সন্ধি** করতে বাধ্য হয় (১৮৪২)।

আফিমের যুদ্ধ
১৮৩৯-৪২

উহার ফলে ইংরেজরা চীনাদের মত সমান মর্যাদা লাভ ও নির্দিষ্ট শুল্ক করের ভিত্তিতে বাণিজ্য করার স্বাধীনতা আদায় করে। হংকং তাদের হস্তগত হয় এবং নতুন পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও

ঐ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। কিন্তু গোপনভাবে আফিম ব্যবসা চলতে থাকে। ফলে চীন ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। অবশেষে 'লেচা অ্যারো' নামে বৃটিশ পতাকাবাহী একটি জাহাজের নাবিককে নিষিদ্ধ মাল বহনের অভিযোগে চীন কারাদণ্ড দিলে **দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ** শুরু হয়। পরে চীন একজন ফরাসী পাদরীদের প্রাণদণ্ড দিলে ফ্রান্সও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দু'বছর যুদ্ধের পর চীন পরাজিত হয় এবং উভয়ের সঙ্গে **তিয়েনসিনে সন্ধি** হয়। ঐ সন্ধির সর্তগুলি ছিল ঃ

নানকিং-এর সন্ধি

(ক) চীন প্রচুর ক্ষতিপূরণ দান সমেত আরও একটি বন্দর তাদের নিকট উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়। চীন শুল্ক পরিবর্তন করার অধিকার হারায়। (খ) আফিম ব্যবসা এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারে পাদরীদের অধিকার ও স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। (গ) পিকিং-এ একজন বৃটিশ অফিসারের বসবাসের অনুমতি ছাড়া বৃটেন ইয়াংসিকিয়াং এলাকা লাভ করে। ফ্রান্স চীনে পারদীদের বাড়ি নির্মাণের অধিকার পায়। অন্যান্য দেশও ঐ অধিকার পাবে ঠিক হয়। কিন্তু চীন পিকিং-এ বিদেশীদের অধিকার দিতে এবং সেখানে সন্ধিতে সই করতে রাজী না হওয়ায় যুদ্ধ বাধে। চীনের সঙ্গে তাদের পিকিং-এ চুক্তি হয় (১৮৬০)। ঐ সব চুক্তি ও সন্ধির ফলে ইউরোপীয়গণ চীনে বহু **মুক্ত বন্দর** ব্যবহারের সুযোগ পায়। মুক্ত বন্দরগুলোর মধ্যে ক্যান্টন, ফু-চাও, নিংপো, সাংহাই, আমুর ও তিয়েনসিন ছিল উল্লেখযোগ্য। ঐ সব বন্দরে তারা নানা অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে। সেখানে তারা নিজেদের কোর্ট ও বাসস্থান নির্মাণ ও নিজেদের আইনের সাহায্যে ইউরোপীয়দের বিচার করত। এভাবে তারা নিজেদের শাসিত অঞ্চল গড়ে তোলে ও চীন তাদের উপর অধিকার হারায়।

তিয়েনসিন সন্ধি
১৮৫৮

বিদেশী শক্তিবর্গের মধ্যে চীনকে খণ্ড খণ্ড করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ

১৮৬০ সালের পর বিভিন্ন শক্তিবর্গ 'ঘুমন্ত দৈত্যকে' খণ্ডবিখণ্ড করার চেষ্টা করে। জাপান চীন আক্রমণ করে এবং সে প্রচুর ক্ষতিপূরণ ছাড়া ফরমোজা ও চারটি মুক্ত বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পায়। ঐ যুদ্ধের পর ফ্রান্স, কম্বোডিয়া, আন্নাম, টংকিং ও চীনের দঃ পূঃ অংশ দখল করে। ইংল্যাণ্ড ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। জার্মানী চীন আক্রমণ করে শান্টং সহ কিয়াওচাও বন্দর ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নেয়। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও পোর্ট আর্থার, বৃটেন ইয়াংসি উপত্যকায় ওয়াই হোয়াই এবং ফ্রান্স ইয়াংসিকিয়াং নদীর দক্ষিণাংশ ইজারা নেয়। বেলজিয়াম রেলপথ নির্মাণের সুযোগ পায়। ম্যাকাও পোর্তুগীজদের হাতে আসে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা দঃ পূঃ এশিয়ায় নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে। আমেরিকা নিজ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্যে চীনে উন্মুক্ত দ্বার নীতি ঘোষণা করে। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন হে সমস্ত শক্তিবর্গের নিকট ঐ নীতি মেনে চলার অনুরোধ

জানান। উহাতে বলা হয় (ক) 'মুক্ত বন্দর' গুলোতে চীনের শুল্কনীতি বলবৎ হবে এবং চীনারাই ঐ সব আদায় করবে। তাছাড়া ঐ সব বন্দরে সব রাষ্ট্রের সমান সুবিধে থাকবে। (খ) ঐ সব প্রভাবাধীন বন্দর ও রেলপথে বিভিন্ন শক্তি নানাজনের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন কর আদায় করবে না। এভাবে চীন সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। বৃটেন, জার্মানী ও রাশিয়া আংশিকভাবে এবং জাপান ও ইতালি সম্পূর্ণভাবে উহা গ্রহণ করবে।

আমেরিকার উন্মুক্ত দ্বার নীতি (১৮৯৯)

খ. চীনে প্রতিক্রিয়া ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজাদের দুর্বলতা ও পাশ্চাত্য শক্তি বর্গের চীন বিরোধী নীতির ফলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। দেশে অরাজকতা চরমে ওঠে। আফিমের চোরা কারবার দেশে হতাশার সৃষ্টি করে। ঐ অবস্থায় সম্রাট ও বিদেশীদের উচ্ছেদ করার জন্যে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। দক্ষিণ চীনে হাক্কা সম্প্রদায়ের নেতা হুং ভগবানের উপাসক সমিতি নামে এক বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল সকলের সমান মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। লম্বা চুলধারী বিদ্রোহী দলের ঐ বিদ্রোহকে সেজন্য ইতিহাসে **তাইপিং বিদ্রোহ** বলা হয়। কথার অর্থ 'চরম শাস্তি'।

তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫০-৬৪)

বিদ্যুৎ গতিতে দক্ষিণ, দক্ষিণ পূঃ, ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকায় ঐ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে (১৮৫০)। হুং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। রাজধানী নানকিং তারা দখল করে ও চরম হত্যাকাণ্ড চালায়। অবশেষে রাণী ডাওয়েজার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের নতুন আদর্শ দেশের সংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করে।

তৎকালীন সম্রাট কোয়াং-সু জাপানের মত পাশ্চাত্যের অনুকরণে চীনের সংস্কার সাধন করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। মিঃ কাং-এর প্রভাবে ঐ আদেশ জারী হয়। ঐ আদেশের মূল কথা ছিল (ক) পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ ও প্রচার। (খ) ছাত্রদের বিদেশ প্রেরণ, (গ) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (ঘ) শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস, (ঙ) সামরিক, ডাক ও শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, (চ) রাজকর্মচারীদের পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি। ঐ আদেশের ফলে দেশে আন্দোলন শুরু হয়। ঐ সুযোগে রাণী ডাওরেজার সম্রাটকে বন্দী করে ক্ষমতা দখল করেন ও সমস্ত কিছু বাতিল করে দেন। সম্রাটের আদেশ মোট একশ দিন স্থায়ী ছিল (১২ই জুন—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)।

শতদিনের সংস্কার

বক্সার বিদ্রোহ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনাদের সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ে বিদেশী এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে। তারা ভেবেছিল খৃষ্টান ধর্ম জোরদার হলে দেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। সম্রাটকে বাঁচাও, বিদেশীদের খতম কর এবং জনসাধারণকে শোষণ থেকে রক্ষা কর ধ্বনি তুলে মুষ্টিযোদ্ধা সমিতি চীনে বিদ্রোহ করে (১৮৯৯)। রাণীও তাদের উৎসাহ দেন। ফলে চীনের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ঐ বিদ্রোহ দেখা যায়। বিদ্রোহীরা পিকিং ও তিয়েনসিন অধিকার করে বিদেশী কর্মচারী এবং চীনা ও বিদেশী খৃষ্টানদের হত্যা করে। জার্মানী ও জাপানের দূত নিহত হন। পিকিং-এ বিদেশীদের আটক রাখা হয়। তাদের সাহায্যে সমস্ত বিদেশী শক্তি মিলিতভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাণী অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে বিদেশীদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তারা চীনকে ভাগাভাগি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমেরিকা চীনের অখণ্ডতা ঘোষণা করায় অন্যায় দেশগুলো পিছিয়ে যায়।

রাণীর প্রতিক্রিয়া

তিনি স্বীকার করেন যে, বিদ্রোহীদের সমর্থন করা চরম ভুল হয়েছিল। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে চীনকে উন্নত করতে না পারলে রাজতন্ত্রকে বাঁচানো যাবে না।

সংস্কার আন্দোলন (১৯০২-১৯০৯) ঃ এদিকে সংস্কারের দাবিতে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়। সমস্ত দলই দেশে সংস্কারের জন্য চাপ দিতে থাকে। ইউয়ানকে সামরিক সংস্কারের ভার দেওয়া হয়। স্কুল কলেজ ও চাকুরী পরীক্ষায় পাশ্চাত্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশ্চাত্য আদর্শে ১৯০৬ সালে সংবিধান তৈরি হয়। উহার ফলে দু-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট চালু হয়। এছাড়া, বাণিজ্য, রাস্তাঘাট, রেলপথ, খনিজ প্রভৃতির সংস্কার ঘটে। লিখিত সংবিধানে সম্রাটের ক্ষমতাবৃদ্ধি হওয়ায় আবার আন্দোলন দেখা দেয়। লিয়াং ও সান ইয়াৎ সেনের চেষ্টায় তুং মেং হুই বিপ্লবীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।



সান ইয়াৎ সেন

মাঞ্চু সম্রাটের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১১-১২) ঃ ঐ অবস্থায় সম্রাট কিছু রেলপথ বিদেশীদের ইজারা দেবার চুক্তি করলে সৈন্যরা হ্যানকাউ শহরে বিদ্রোহ করে। রাজপরিবার ইউয়ানের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা নানকিং-এ ডঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র

ঘোষণা করে। (১৯১১)। পরে সামরিক নেতা ইউয়ান মাঞ্চু সম্রাটকে পদচ্যুত করে (১৯১২) নিজে ক্ষমতা দখল করেন।

তিনি ১৮৬৬ সালে ক্যান্টনে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন মাঞ্চু সম্রাটকে উচ্ছেদ করতে না পারলে চীনকে বাঁচানো যাবে না। জাপানের পরাজয়ের পর তিনি ক্যান্টনে বিদ্রোহ করেন ও দেশত্যাগে বাধ্য হন। পরে তাঁর দল তুং মেং হুই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটায়। তাদের সমর্থনে তিনি ১৯১১ সালে দক্ষিণ চীনে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন।

ইউয়ান-সি কাই (১৮৫৯-১৯১৬) ঃ তিনি চীনের নানা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদ লাভ করেন। বিপ্লবীদের সাহায্য দিলেও তিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রবিরোধী ও একনায়কতন্ত্রের সমর্থক। ১৯১১ সালে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী ঘোষণা করলে তিনি সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ডঃ সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে চুক্তি হলে তিনি সম্রাটকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন (১৯১১) এবং চীন প্রতাজন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন (১৯১২)।

গ. জাপানের অভ্যুদয়

সূচনা ঃ জাপানের উত্থান আধুনিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঐ দেশ বৃহৎ শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে।

সম্রাটের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৮৬৭) ঃ জাপান চীনের মত নিজেকে পশ্চিমীদের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। দেশে পুরাতন প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে জাপান বিদেশীদের সংস্পর্শে আসে। শোগান তাদের নানা সুযোগ-সুবিধে দান করেন। ফলে পাশ্চাত্য ও শোগান বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। অবশেষে ১৮৬৭ সালের বিদ্রোহে শোগান ক্ষমতাচ্যুত হন ও মেইজি যুগে সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। মিকাডো মুৎসিহিতো সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

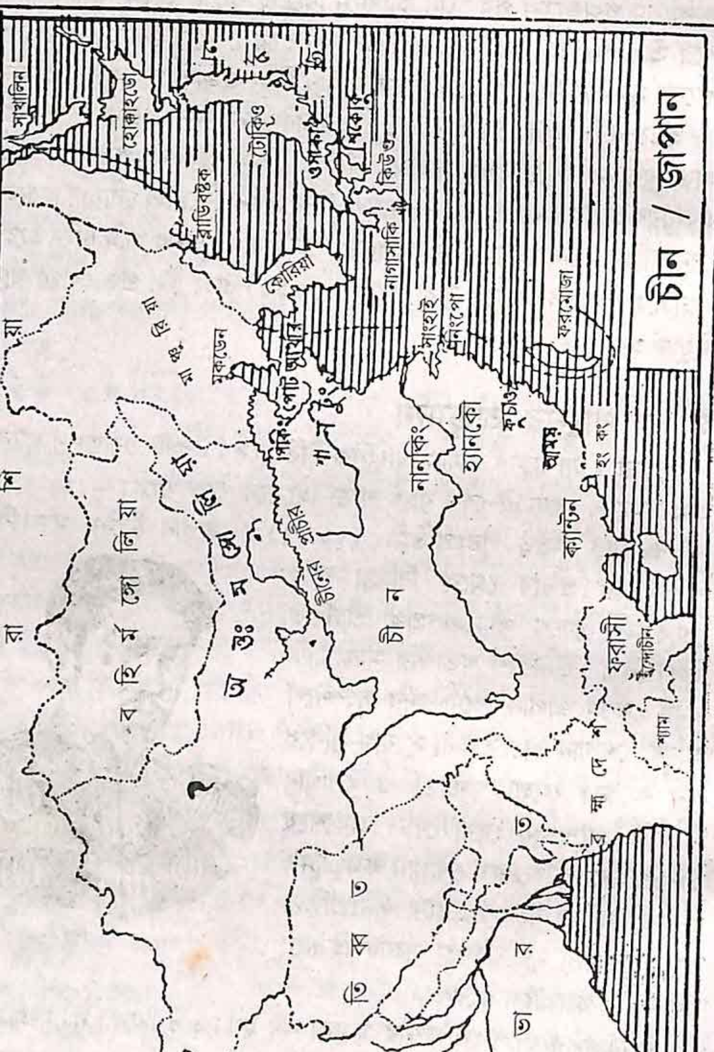


সম্রাট মুৎসিহিতো

ঐ বিপ্লবের ফলে শোগানের ক্ষমতা নষ্ট হয়। এত দিনের নামে-মাত্র সম্রাট রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার ও জনসাধারণের রক্ষক বলে ঘোষিত হন। জাপানে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

সম্রাটের ভূমিকা

জাপানের পাশ্চাত্যকরণ ঃ সম্রাট মুৎসিহিতো বুঝেছিলেন যে, জাপানকে


চীন / জাপান
সাখালিন
হোক্কাইডো
ভ্লাডিভস্টক
টোকিও
ওসাকা
কিয়োটো
কোরিয়া
নাগাসাকি
মুকডেন
পোর্ট আর্থার
পিকিং
সাংহাই
নিংপো
ফরমোজা
নানকিং
হ্যানকৌ
ক্যান্টন
হং কং
ফরাসী
শ্যাম
চী ন

বাঁচাতে হলে পাশ্চাত্যের অনুকরণ দরকার। তিনি দেশের পুরাতন আইন সংস্কার করে পাশ্চাত্যের আদর্শে জাপানকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

রাজনৈতিক সংস্কার

সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। জার্মানী ও ফ্রান্সের অনুকরণে আইনের সংস্কার হয়। বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৮৯ সালের সংবিধান নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট গঠন করে। উহাতে বলা হয়, সম্রাট মন্ত্রীদের পরামর্শ ও সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করবেন। দেশে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করা হয়।

অর্থনৈতিক

দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সামন্ত প্রথা লোপ করা হয়। সরকার নিজস্ব চেষ্টায় রেলপথ, খনি, ডাক ও তার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। দশমিক মুদ্রা চালু হয়। ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য সংস্থা গড়ে ওঠে।

সামাজিক ঃ সামন্ত প্রথার অবসানে দেশে দাসপ্রথা ও শ্রেণীস্বার্থ লোপ পায়। সকলের সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়। নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিদেশে পাঠানো হয়। সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। বিদেশী পোষাক, ইংরেজী ক্যালেণ্ডার ও কারিগরী শিক্ষা দেশে চালু হয়।

সামরিক

সম্রাট ছিলেন সর্বাধিনায়ক। সরকার পুরাতন নাইট ও সামন্তদের ক্ষমতা লোপ করেন। জার্মানীর ও ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে স্থল ও নৌ-বাহিনী গড়ে ওঠে। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। জাতীয় সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে। সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হয়।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ঃ নানা সংস্কারের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে প্ররিণত হয়। ফলে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চীন-জাপান যুদ্ধে উহার সূত্রপাত হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) ঃ কোরিয়াকে কেন্দ্র করে জাপান ও চীনে বহুদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। কোরিয়া ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প বিপ্লব ও নানা কারণে কোরিয়ার কাঁচামাল ও বাজার জাপানের অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এদিকে ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি জাপানের ভয়ের কারণ হয়। ফলে চীন ১৮৯৪ সালে পূর্ব চুক্তি লঙ্ঘন করলে জাপান কোরিয়ায় সৈন্য পাঠায়। ফলে দু'পক্ষে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে চীন পরাজিত হয় ও সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ঐ সন্ধির ফলে জাপান প্রচুর ক্ষতিপূরণসহ ফরমোজা, লিয়াংতুং প্রভৃতি অঞ্চল লাভ করে ও চারটি বন্দর তার নিকট উন্মুক্ত হয়।

জাপান-ইংল্যাণ্ড মৈত্রী (১৯০২) ঃ চীন-জাপান যুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্স চাপ সৃষ্টি করে জাপানকে চীনের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। অন্যদিকে, চীনের ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধীতায় ইংল্যাণ্ডও একঘরে হয়ে পড়ে। সেও কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতা বিস্তারের ঘোর বিরোধী ছিল। সুতরাং দু'পক্ষ ১৯০২ সালে মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন করে। উহাতে বলা হয়, তারা একাধিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে পরস্পরকে সাহায্য করবে। ঐ চুক্তির দ্বারা জাপান বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পায়। ইংল্যাণ্ড কোরিয়ায় জাপানের অধিকার মেনে নেয়। পরে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে জাপান ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতায় চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

সাইবেরিয়ান রেলপথ প্রসারের ফলে মাঞ্চুরিয়া ও পোর্ট আর্থার রাশিয়ার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। পরে রাশিয়া কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে উদ্যত হলে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়া রাজী না হওয়ায় দু'পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় (১৯০৪)। রাশিয়া পরাজিত হয় ও জাপানের সঙ্গে পোর্টস-মাউথে (১৯০৫) সন্ধি করে। সন্ধির ফলে কোরিয়ায় জাপানের প্রভাব স্বীকৃত হয় ও মাঞ্চুরিয়া থেকে রাশিয়ার সৈন্য অপসারিত হয়। জাপানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং সে আরও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। সে কোরিয়া দখল এবং চীনের অধীন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় নিজের সুবিধে বৃদ্ধি করে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় (১৯১৪)। জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দেয় এবং চীনে জার্মানীর বাণিজ্য এলাকা অধিকার করে। কিন্তু উহাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সে দুর্বল চীনের উপর **২১ দফা দাবী** পেশ করে (১৯১৪)। উহাতে বলা হয় ঃ

(১) চীনের শানটুং ও দঃ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের বসবাস, ভ্রমণ, জমি ক্রয় ও রেলপথ নির্মাণের সুযোগ দিতে হবে। পোর্ট আর্থার ও কিছু বন্দর উন্মুক্ত করতে হবে।

(২) শানটুং প্রদেশ সহ উহার তীরবর্তী কোন দ্বীপ ও পোতাশ্রয় তার অনুমতি ছাড়া চীন বিদেশীদের ছেড়ে অথবা ইজারা দেবে না কিংবা তাদের কোন ভাবে নিয়োগ করবে না।

(৩) চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার, পুলিশ ও সামরিক ব্যাপারে যৌথ প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঐ সব দাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকা ঐ দাবীর বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত চীন ঐ দাবির অনেকগুলো মেনে নেয় এবং অনেকগুলো মেনে নেবার অঙ্গীকার করে। ফলে চীনে জাপানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

- জাপানে কিভাবে পাশ্চাত্তীকরণ ঘটে? তার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বর্ণনা কর।
- আর্থিক ও সামরিক সংস্কার কিভাবে ঘটে?
- চীন-জাপান যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ।
- 'একশ' দফা দাবী কি? উহার ফল কি হয়?

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- জাপানে বিপ্লব কবে ঘটে?
- ঐ সময় সম্রাট কে ছিলেন?
- চীন-জাপান যুদ্ধ কবে ঘটেছিলেন?
- রুশ-জাপান যুদ্ধ কবে ঘটে?
- জাপান-ইংল্যান্ড মৈত্রী চুক্তি কবে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল? (বোধমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক) আফিমের যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের ফল (বোধমূলক)
হংকং ইংরেজরা দখল করে/মাঞ্চু রাজা ক্ষমতাচ্যুত/ চীনে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন/মাও সে তুং এর পলায়ন।

খ) চীনকে প্রথম দিকে বলা হোত (জ্ঞানমূলক)
ঘুমন্ত দৈত্য/শিল্পোন্নত দেশ/গরীব দেশ/বর্বর দেশ/

গ) তাইপিং বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (জ্ঞানমূলক)
শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা/শোষণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা/ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানানো/জাপ্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন।

ঘ) সান ইয়াৎ সেনের সরকারের শাসননীতি ছিল (জ্ঞানমূলক)
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা/প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা/সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা/সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠা।

ঙ) জাপানে মেইজিযুগের শুরু হয়
১৮১৫/১৮৪৮/১৮৫৭/১৮৬৭ সালে

চ) ১৯১৪ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা হোল (জ্ঞানমূলক)
রাশিয়ার বিপ্লব/নবজাগরণ/ভারতের স্বাধীনতা লাভ/প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১১

বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ

(১৮৫৮-১৯১৪)

১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন ঘটে। **মহারাণী ভিক্টোরিয়া** এক **ঘোষণায়** ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁর হয়ে এদেশের শাসনকার্য দেখবেন **ভারত সচিব** নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে কাউন্সিল গঠিত হয়। গভর্ণর জেনারেল 'ভাইসরয়' নামে পরিচিত হন। ঐ ঘোষণায় পরধর্মসহিষ্ণুতা, ন্যায় বিচার, রাজাদের অধিকার রক্ষা প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। শহরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ও গ্রামের জন্য জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। উহাতে ভারতীয়দের সদস্য হবার সুযোগ ছিল। সিভিল সার্ভিসেও কিছু পরিবর্তন হয়। সরকারের আর্থিক ব্যাপারেও কিছু পরিবর্তন ঘটে তবে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাই ছিল স্বৈরাচারী ও ভারতীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী। সরকার বিভেদনীতি অনুসরণ করতেন।

নতুন শাসন ব্যবস্থা

ঐ সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় ছোট বড় রাজ্যসমূহ ইংরেজের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। তাদের পরামর্শ ব্যতীত বাইরের কোন দেশের সঙ্গে চুক্তি করা ভারতীয়দের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে সারা ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম হয়। পরে ১৮৭৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়। এদিকে রাশিয়ার ভারত আক্রমণের ভয়ে বৃটিশ সরকার আফগানিস্তান দখল করে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। অন্যদিকে, ফ্রান্সের ভয়ে ব্রহ্মদেশও দখলে আসে। ফলে আফগানিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়।

সাম্রাজ্যের বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঃ বৃটিশদের ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। কুসংস্কার

মুক্ত হয়ে কিছু কিছু মনীষী এদেশের সমাজ, শিক্ষা ও নানা বিষয়ে সংস্কারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ঃ ঐ যুগের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর চিন্তাধারা ও মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা ভারতের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করে। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে তিনি কুসংস্কার ও প্রাচীন মতবাদকে সমর্থন করেননি। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি নারীর মর্যাদা, বাল্য বিবাহ ও মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির বিরোধিতাও উপেক্ষা করেন। **ব্রাহ্ম সমাজের** প্রতিষ্ঠা করে তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম একতার উপর জোর দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর সহযোগিতায় **সতীদাহপ্রথা** তুলে দেন। তাঁর প্রভাবে দেশে আধুনিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ঐ বিরাট পুরুষ ১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে পরলোকগমন করেন। এছাড়া তিনি রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তাঁকে **আধুনিক ভারতের জনক** বলে অভিহিত করা হয়।

কেশব সেন ভারতীয় সংস্কার সভার মাধ্যমে নারী প্রগতি, মদ্যপান বর্জন ও জনহিতকর কাজে উৎসাহ দেন।

প্রার্থনা সমাজ ঃ কেবশচন্দ্র সেনের চেষ্টায় ১৮৬৭ সালে বোম্বাই শহরে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমাজের সভ্যগণ সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। পুনার বিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে অন্যান্য নেতাদের সাহায্যে জাতিভেদ প্রথা বিলোপ, বিভিন্নজাতির মধ্যে বিবাহ, পর্দাপ্রথা, বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের আদর্শও প্রচার করেন।

আর্য সমাজ ঃ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনকে ভিত্তি করে সমাজের উন্নতির চেষ্টা করেন দয়ানন্দ সরস্বতী। ঐ উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ হিন্দু সমাজকে গড়তে চাইলেও তিনি ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, জাতিভেদ প্রথা ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে উহার প্রচুর প্রভাব ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-বৈদিক স্কুল পরে কলেজে পরিণত হয়।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ঃ তিনি জীবকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে বলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শকে প্রচার করেন শিষ্য **বিবেকানন্দ**। তাছাড়া, তিনি জাতীয় জীবনের উন্নতি, নারীর মর্যাদা, মানুষের সম - অধিকার ও আর্থিক উন্নতির

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

কথা জোরালোভাবে প্রচার করেন। মানুষের প্রতি ঘৃণাকে তিনি পাপ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে **রামকৃষ্ণ মিশন** প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বাণী দেশের তরুণদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। দঃ ভারতে থিওসফিক্যাল সোসাইটি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করে। অ্যানি বেসান্ত উহার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শিক্ষা প্রসারেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) : তিনি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ ও অন্যান্য কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি বালিকা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি শিশুদের পাঠের জন্য 'বর্ণবোধ' রচনা করেন।



বিদ্যাসাগর

স্যার সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭-১৮৯৮) : মুসলিমদের শিক্ষা প্রসারে ও সমাজ সংস্কারে স্যার সৈয়দ আহমেদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দ আহমেদ সরকারের সহযোগিতায় আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতবাদ গোঁড়া



স্যার সৈয়দ আহমেদ



ডিরোজিও

মুসলিমদের আক্রমণের শিকার হয়। তিনি বহু বিবাহ ও পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন। বোম্বাই শহরে বদরুদ্দীন তায়েবজী মুসলিম সমাজের কু-সংস্কার দূর করার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ স্কুলের শিক্ষক **ডিরোজিও** স্বাধীন যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছাত্রদের সব কিছুকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলায় **'নব্যবঙ্গ'** নামে একদল ছাত্র প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে ডিরোজিও স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। তাঁর শিষ্যগণ পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে দেশে আধুনিক মতামত গঠনে সাহায্য করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাইকেল প্রভৃতি বিখ্যাত।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

ভারতে বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রিতিষ্ঠিত হলে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণ নীতি ভারতীয়দের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এদেশের কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস হয়। ভারত ইংল্যাণ্ডের শিল্পের কাঁচামালের যোগানকারী দেশে পরিণত হয়। বেকার সমস্যা চরমে ওঠে। দেশের ধন-সম্পদ নানাভাবে বিদেশে পাচার হতে থাকে। জমিদারী ব্যবস্থায় কৃষকগণ অত্যাচারের শিকার হয়। নানা ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থাও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারায়। ভারতীয়দের ইংরেজরা ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। শাসন ব্যবস্থায় তাদের অংশ ছিল না। এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইংরেজরা অবজ্ঞার চোখে দেখত। ফলে সব শ্রেণীর মানুষ ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে, ফরাসী বিপ্লব, ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমেও জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ ক্রমেই ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধ প্রবলতর হতে থাকে। ইংরেজ সরকার সেজন্য শিক্ষিত ভারতীয়দের সরকারের সমর্থনে আনার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে সরকারকে ভারতবাসীদের অভিযোগ সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর ইচ্ছা ছিল। শেষ পর্যন্ত মিঃ হিউম ও লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে। প্রথম ঐ অধিবেশনে স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম ঐ অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন।

প্রথমদিকে কংগ্রেসে **নরমপন্থীদের** প্রাধান্য ছিল। তাঁরা বৃটিশ শাসনকে আশীর্বাদ বলে মনে করতেন এবং দরখাস্ত ও **আবেদন-নিবেদনের** মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবীদাওয়া পেশ করতেন। তাঁরা স্বরাজ ও স্বাধীনতা দাবী করেন নাই। নেতাদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ফিরোজ মেটা, প্রভৃতি ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজ রাজকর্মচারিগণ উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু ক্রমেই কংগ্রেস সরকার বিরোধীনীতি গ্রহণ করলে তারা ঐ সভায় আর যোগদান করেননি। এদিকে কংগ্রেসে **উগ্রপন্থী** নামে এক দলের সৃষ্টি হয়। ঐ নেতারা কংগ্রেসকে আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার জন্যে চাপ দেন। মহারাষ্ট্রে

চরমপন্থী আন্দোলন
(১৯০৫-১৯১৪)



ঋষি অরবিন্দ



লালা লাজপৎ রায়

তিলক, পাঞ্জাবে লাজপৎ রায় এবং বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঐ জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন। সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, কেশরী প্রভৃতি পত্রিকা যুবকদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে। এদিকে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইনকে কেন্দ্র করে (১৯০৫) স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন দেশে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সর্বত্র বিলিতি জিনিস বর্জন কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার চরম দমননীতি চালায়। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়, পারস্য, ইতালি ও আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রাম তরুণদের মনে বিপ্লবী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এদিকে কংগ্রেসে স্বরাজ অর্জনের পথ নিয়ে নরমপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাধে। অবশেষে উগ্রপন্থীদের জয় হয়। তাঁরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করেন।

দেশে বহু গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। **বাংলার** অনুশীলন সমিতি, মহারাষ্ট্রের অভিনব ভারত ও মিত্রমেলা যুবকদের মনে দেশপ্রেম বাড়িয়ে তোলে। উত্তর-

পশ্চিম ভারত, বোম্বাই ও অন্যত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। দেশে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির চেষ্টাও হয়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হন। ধৃত ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এদিকে বারীন ঘোষ, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ **আলিপুর বোমার মামলায়** বন্দী হন। বারীন ঘোষ ও অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কার দেশের আশাপূরণে ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী বসু পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিপ্লবীদের উৎসাহিত করেন। তিনি দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলেন। শেষে তিনি জাপান পালিয়ে যান। বিদেশী অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘা যতীন এক খণ্ডযুদ্ধে উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীরে নিহত হন।

বিপ্লবী কার্যকলাপ



ক্ষুদিরাম



বাসুদেব ফাদ্‌কে

তাছাড়া, সত্যেন বসু, কানাই দত্ত ও অনেকের ফাঁসি হয়। **মহারাষ্ট্রে** বিপ্লবের সূত্রপাত করেন বাসুদেব ফাদ্‌কে। তিনি এডেনে নির্বাসিত হন। পরে বীর সাভারকর বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। **পাঞ্জাবে** লালা লাজপৎ রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হরদয়াল, অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেকেই **লাহোর ষড়যন্ত্র** মামলায় ধরা পড়েন। রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়। আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়গণ **গদর পার্টি** প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে বিপ্লবী কার্যধারা সারা ভারত ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির ফলে ঐ সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়।

বাঘা যতীন

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- ১৮৫৮ সালের পর শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য বিস্তারে কি পরিবর্তন দেখা যায়? (জ্ঞানমূলক)
- উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রামমোহন, স্যার সৈয়দ আহমেদ ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি ছিল? (বোধমূলক)
- সমাজ সংস্কার আন্দোলনে প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অবদান আলোচনা কর। (জ্ঞান-প্রয়োগমূলক)
- ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের কারণ কি? চরমপন্থীদের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে? (জ্ঞান- বোধমূলক)
- বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী কার্যকলাপের আলোচনা কর। (জ্ঞান-বোধমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- কংগ্রেসে চরমপন্থীদের মূলনীতি কি ছিল? (জ্ঞানমূলক)
- বঙ্গভঙ্গ কিভাবে জাতীয়তাবোধ বাড়িয়ে তোলে? (বোধমূলক)

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- মহারাণীর পক্ষে ভারতের শাসন কে তদারকি করতেন? (জ্ঞানমূলক)
- আর্য সমাজের কে প্রতিষ্ঠা করেন? ঐ
- কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে? ঐ
- কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ঐ
- বঙ্গভঙ্গ আইন কবে পাশ হয়? ঐ
- অনুশীলন সমিতি। অভিনব ভারত। মিত্রমেলা। গদর পার্টি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১) মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৭ সালের যে উপাধি পান তা ছিল (জ্ঞানমূলক)
ভারত সম্রাজ্ঞী/ভারতভূষণ/ভারত বন্ধু/ভারত মাতা।

২) ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান কীর্তি ছিল
বাল্য বিবাহ/সতীদাহ প্রথা/নারী শিক্ষা/পাশ্চাত্য শিক্ষার বিলুপ্তি।

৩) রাসবিহারী বসু বিপ্লবী হিসাবে বিখ্যাত তার কারণ
তিনি ক্ষুদিরামকে দীক্ষা দিয়েছিলেন
তিনি নেহরুর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন
তিনি উত্তর ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন
তিনি হিন্দু কুসংস্কার দূর করেন।

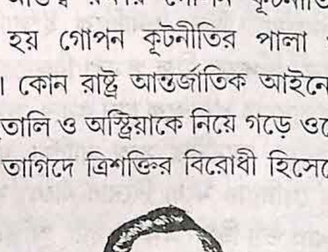
১২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

কারণসমূহ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নানা কারণে ঐ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঐ কারণগুলোকে নানাভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

পুরাতন সাম্রাজ্যের পতন ও আন্ত-র্জাতিক নৈরাজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুরাতন অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফলে যে শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, উহা অধিকার করার জন্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এদিকে নতুন রাষ্ট্র ইতালি ও জার্মানী অস্তিত্ব রক্ষায় গোপন কূটনীতির আশ্রয় নেয়। শুরু হয় গোপন কূটনীতির পালা ও অরাজকতার রাজত্ব। কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় নাই। একদিকে, জার্মানী, ইতালি ও অস্ট্রিয়াকে নিয়ে গড়ে ওঠে ত্রিশক্তি মৈত্রী চুক্তি। অন্যদিকে আত্মরক্ষার তাগিদে ত্রিশক্তির বিরোধী হিসেবে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিয়ে গঠিত হয় ত্রিশক্তি আঁতাত **সামরিক জোট**। তাদের এমন পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ছিল যে এক অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ঐ পরিবেশে বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।


সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

আন্তর্জাতিক ঐ অবস্থায় ইতালি ও জার্মানীর নিজস্ব নীতি অবস্থাকে অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। সম্রাট কাইজার উইলিাম জার্মানীর সম্রাট হিসেবে বিসমার্কের কূটনীতি পরিত্যাগ করে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়াকে বন্ধুভাবে দেখেন নাই। তিনি দেশে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর দেশ ইউরোপ ও বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্ব

সম্রাট কাইজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ

করবে। সৈন্যবৃদ্ধি ও অস্ত্রসজ্জা চরমভাবে বেড়ে চলে। অন্যান্য দেশও ঐ পথ গ্রহণ করে। এজন্য ঐ সময়ের ইউরোপকে বলা হয় **'সশস্ত্র শান্তির যুগ'**। ইউরোপ বারুদের দুর্গে পরিণত হয়। ঐ সময় সামরিক নেতারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা শান্তিচুক্তির বদলে যুদ্ধকেই বেছে নেন।

উপনিবেশ নিয়ে দ্বন্দ্ব ঃ পূর্বে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে উপনিবেশ নিয়ে মনোমালিন্য ছিল। ইতালি ও জার্মানীর সৃষ্টি হবার পর তারা উপনিবেশ বিস্তারে মন দেয়। জার্মানী নৌশক্তি বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং, জার্মানীর সঙ্গে নৌশক্তিতে শক্তিমান ইংল্যাণ্ডের বিরোধ বাধে। যুদ্ধের ঠিক পূর্বে মরক্কো নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানী, টিউনিসিয়া নিয়ে ইতালি ও ফ্রান্স, দঃ আফ্রিকা নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী এবং সুদূর প্রাচ্য নিয়ে রাশিয়া ও জাপান প্রভৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। উহার ফলে বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়।

নিকট প্রাচ্য নিয়ে শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ নিকট প্রাচ্য অঞ্চল নিয়ে সব রাষ্ট্রই কমবেশী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী ছিল। অন্যদিকে, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উহার বিরোধিতা করে। জার্মানী শ্লাভ অঞ্চলে নিজ ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল এবং ঐ অঞ্চলে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের প্রভাবকে হ্রাস করার চেষ্টা করে। এদিকে শ্লাভবাদ নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়া, জার্মানীর সঙ্গে সার্বিয়া এবং ঐ অঞ্চলে আধিপত্য নিয়ে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিরোধ বাধে। ফলে সার্বিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তা ভয়ঙ্কর হবার ভয় ছিল। এমতাবস্থায় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁর পত্নী ইসাবেলা ১৯১৪ সালে বসনিয়ায় এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয় রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়, জার্মানী ও বুলগেরিয়া। এভাবে ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ঃ ঐ যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে মারাত্মক ও ব্যাপক। জলে, স্থলে ও আকাশে ঐ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ যুদ্ধ প্রায় চার বছর তিন মাস স্থায়ী হয়। পৃথিবীর ত্রিশটি দেশ ও উপনিবেশগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক কোটি লোক নিহত এবং দু-কোটি লোক আহত হয়। প্রায় ছ-কোটি টাকা ব্যয় হয়। মেসিনগান, ট্যাঙ্ক, বিমান, সাবমেরিন, ইউবোট প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ঐ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধে জার্মান পক্ষের পরাজয় ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমতঃ, ঐ যুদ্ধে অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতির ফলে আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় যে উহার সমাধানে বেশ কয়েকবছর সময় লাগে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ যুদ্ধে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার অংশ নিয়ে চেকোশ্লোভিয়াকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ, ঐ যুদ্ধে রাশিয়ার পারজয় ও অর্থসঙ্কটের ফলে দেশে বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়। ঐ সুযোগে দেশে বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থতঃ, ঐ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। উহা থেকে মুক্তির আশায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো **জাতিসঙ্ঘের** প্রতিষ্ঠা করে। পঞ্চমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

ফলাফল

অনুশীলনী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

ক) জামনীর সম্রাট কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

খ) অস্ট্রিয়ার যুবরাজের নাম কি ছিল?

গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে ঘটে?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদ কিভাবে যুদ্ধ ঘটায়? (বোধমূলক)

খ) উপনিবেশ ও নিকট প্রাচ্য নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে কিভাবে যুদ্ধ ঘটে? (বোধমূলক)

গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ফলাফল লিখ। (জ্ঞান-বোধমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)

খ) ত্রিশক্তি মৈত্রী চুক্তি কি? (জ্ঞানমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

● ১৯১৪-১৯৩৯ সালকে ইউরোপকে সশস্ত্রযুগ বলার কারণ—

● ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ নীতি/হিটলারের নীতি/আমেরিকার নীতি/সমস্ত ইউরোপে অস্ত্রসজ্জা ও সৈন্যবৃদ্ধি।

১৩

রাশিয়ায় বিপ্লব

ইউরোপ মহাদেশের পূর্বাংশ ও এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশ জুড়ে যে বিরাট দেশ ছিল তার নাম সোভিয়েত রাশিয়া। ঐ দেশ পূর্বে কমিউনিস্ট সরকারের অধীন ছিল। ১৯১৭ সালে ঐ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বিপ্লবের পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল।

জারের অত্যাচারী শাসন : রাশিয়ায় রোমানভ বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁরা জার নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সামন্ত, অভিজাত ও গুপ্তচরদের সাহায্যে স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন চালাতেন। জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, ইতালি, প্রভৃতি দেশের বিপ্লব ঐ দেশে ধাক্কা দেয়। জনসাধারণ ভূমি সংস্কার, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। জার প্রথম নিকোলাস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ঐ আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করেন। ফলে দেশের নানা স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে এবং তারা জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে।

বহুকাল থেকে রাশিয়ায় ভূমিদাস ও সামন্তপ্রথা চালু ছিল। জারের অনুগত সামন্ত ও জোতদারগণ কৃষক ও ভূমিদাসদের নানাভাবে অত্যাচার ও শোষণ করত। দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত। তাছাড়া, তারা করভাবে জর্জরিত ছিল। দেশের ভালো ভালো সব জমি সামন্তরা দখল করত। ফলে কৃষকরা ১৯১৭ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা রদ করেন। কিন্তু তাদের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তারাও আন্দোলনে সামিল হয়।

সামন্ততন্ত্র ও কৃষকদের শোষণ

শিল্প বিপ্লব ও শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ঐ দেশে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। জমিহীন কৃষক ও স্বাধীন দাস সকলেই শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়। শিল্প এলাকার নোংরা ও বস্তি জীবন তাদের জীবনকে

বিষিয়ে তোলে। মালিকগণ প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। কিন্তু তারা শ্রমিকদের উন্নতির দিকে কোন নজর দিত না। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা গড়ে ওঠে। এদিকে কমরেড **লেনিন** ও তাঁর সহযোগী বন্ধুগণ তাদের মধ্যে মার্কসবাদী আদর্শ জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে আন্দোলন চালাতে থাকে। সম্রাট তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে থাকেন। ফলে ১৯১৭ সালের বিপ্লবে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এছাড়া, রাশিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বদলে রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি জোর করে শিখতে হতো। এজন্য তারাও খুব অসন্তুষ্ট ছিল।

বিপ্লবের আদর্শবাদ : কোন বিপ্লব আদর্শ ছাড়া ঘটতে পারে না। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের আইন দেশে বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। শ্লাভবাদ লোকেদের মনে জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলে। কৃষকদের সংগঠন (কমিউন) ও গণস্বাধীনতা সমিতিও গঠিত হয়। দস্তয়ভস্কি, তুর্গেনিভ প্রভৃতি মনীষীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি দাবী করতে থাকেন। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক বিপ্লবের জন্য নিহিলিষ্ট ও নরোডনিক প্রভৃতি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ জনপ্রিয় হয় এবং লেনিনের ডাকে কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

মার্কসবাদ ও লেনিন

লেনিন ১৮৭০ সালে ভলগা নদীর তীরে উলিয়ানভস্ক্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিইচ উলিয়ানভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মার্কসবাদের প্রভাবে পড়েন এবং আন্দোলন করার জন্যে জার আমলে কারাবরণ করেন। রাশিয়ায় তিনি বিভিন্ন অংশের মার্কসবাদী দলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ইস্‌ক্রো (স্ফুলিঙ্গ) নামে মার্কসবাদী পত্রিকায় তিনি লেনিন ছদ্মনামে লিখতেন। এভাবে তিনি লেনিন নামে পরিচিত হন। লেনিনের অনুগামীগণ বলশেভিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) পার্টি নামে পরিচিত হন। তাঁর বিরোধী কম্যুনিস্টদের বলা হয় মেনশেভিক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ঐ পার্টির নাম হয় কমিউনিস্ট পার্টি।

ইতিমধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। দেশে ছোট-খাট বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ খুব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ঐ সময় রাজধানী পেট্রো গ্রাডের হাজার হাজার শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ মিছিলের

উপর জারের পুলিশ গুলি চালায়। ফলে দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক ও সেনাদল তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু জার উহা নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। এদিকে অবস্থার আরও অবনতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বার বার পরাজয় ঘটে। দেশে খাদ্যাভাব, উৎপাদন হ্রাস, শ্রমিক ছাঁটাই ও মুদ্রাস্ফীতি চরমে ওঠে। ডুমার (প্রতিনিধি সভা) সদস্যগণ আরও উদারনৈতিক অধিকার ও জারতন্ত্রের অবসান দাবী করেন। শ্রমিকগণ সোভিয়েত গঠন করে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়। অবশেষে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষক ও শ্রমিক ধর্মঘট করে ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জারের আদেশ অমান্য করে সেনাদল তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এদিকে ডুমার (প্রতিনিধি সভা) সদস্যগণ বিদ্রোহীদের সমর্থনে রাজতন্ত্রের অবসান দাবী করেন এবং জমিদার লুভভের নেতৃত্বে সাময়িক সরকার গঠন করেন। জার তাঁর ভ্রাতা

১৯১৭ সালের বিপ্লব



লেনিন



জার নিকোলাস

মাইকেল রোমানভকে সিংহাসন দান করে পলায়ন করেন। দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়। ঐ অবস্থায় লেনিন, ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিন দেশে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন জোরদার করেন। যেমন, (১) জোতদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা (২) দিনে আট ঘণ্টা কাজ, (৩) কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন, (৪) সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার এবং (৫) যুদ্ধ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে লেনিন দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকার তাঁদের উপর অত্যাচার শুরু করে। ফলে লেনিন দেশ থেকে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে সরকার বলশেভিক পার্টি ও সৈন্যদের ক্ষমতা দখলের নির্দেশ দেন। ট্রট্স্কির নেতৃত্বে বলশেভিক লালবাহিনী পরিকল্পনা মত ৭ই নভেম্বর গভীর রাতে

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে। প্রায় বিনা রক্তপাতে বলশেভিক দল ক্ষমতা দখল করেন। ঐ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং লেনিন হলেন উহার সভাপতি।

ইউরোপ ও বিশ্বে বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব ইউরোপ ও বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমতঃ, স্বৈরতন্ত্রের অবসানে সোভিয়েত রাশিয়ায় সর্বহারা সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। উহার নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন পরীক্ষা শুরু হয়। লেনিন, ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও সংগঠন প্রতিভার গুণে সোভিয়েত সরকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কার্ল মার্কসের নীতির সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সাফল্যে ইউরোপে ঐ আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করে। বর্তমানে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সমাজবাদী আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে এবং নানা দেশে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে সমাজবাদ বিশ্ব মতবাদে পরিণত হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক ও সর্বহারার দল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তৃতীয়তঃ, পুঁজিপতি দেশগুলোও শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কিছুটা নজর দিতে বাধ্য হয়েছে। চতুর্থতঃ, সমাজতন্ত্রবাদের ভয়ে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠে। তারা কমিউনিস্ট আদর্শ যাতে আর ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে কমিউনিজম্ বিরোধী সংঘ গড়ে তোলে। প্রথমদিকে জার্মানী, ইতালি ও জাপান এবং বর্তমানে আমেরিকা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পঞ্চমতঃ, মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সমালোচনা করায় পরাধীন দেশ ও উপনিবেশ সমূহ তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাশিয়ার বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

ক) জার কোন্ বংশের সম্রাট ছিলেন?
খ) কোন্ সময় রাশিয়ার শিল্প বিপ্লব শুরু হয়?
গ) রাশিয়ার মার্কসবাদী পার্টি কবে প্রতিষ্ঠা হয়?
ঘ) লেনিনের আসল নাম কি?
ঙ) ১৯০৫ সালের বিপ্লব কোথায় ঘটে?
চ) রাশিয়ার আইন সভার নাম কি?
ছ) শেষ জার সম্রাট কে ছিলেন?
জ) শেষ বিপ্লব কবে ঘটে?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- রাশিয়ার বিপ্লবের পেছনে কি কি কারণ ছিল? উহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা কর। (জ্ঞানমূলক)
- আদর্শবাদ কিভাবে বিপ্লবে সাহায্য করেছিল? ঐ প্রসঙ্গে লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর। (বোধ/প্রয়োগমূলক)
- ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কারণ কি? (জ্ঞানমূলক)
  ইউরোপ ও বিশ্বে বলশেভিক বিপ্লবের কি প্রভাব দেখা যায়? (প্রয়োগমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- বলশেভিক পার্টির নামকরণ কেন হয়েছিল? (বোধমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

রাশিয়ার লেনিন ক্ষমতা দখল করেন (জ্ঞানমূলক)
১৯১৭/১৯১৯/১৯৩৫/১৯৪৭ সালে।

১৪

ইউরোপের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৩৯)

প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯) ঃ ১৯১৯ সালে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্যারিসে স্থায়ী শান্তি বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে পঞ্চ প্রধান আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জাপান, ইতালিসহ মোট ৭০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। জার্মানী, তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন, ফ্রান্সের ক্লেমাঁসো ও ইংল্যাণ্ডের লয়েড জর্জ ঐ সম্মেলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে জাপান ও ইতালি বৈঠক ত্যাগ করে। ক্লেমাঁসো জার্মান রাষ্ট্রকে সমস্ত দিক থেকে চিরদিনের মত পঙ্গু করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, আদর্শবাদী প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঐ সভায় বিখ্যাত **চৌদ্দ দফা** নীতি ঘোষণা করেন। সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ক্লেমাঁসো। অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর মূল খসড়া প্রস্তুত হয় এবং যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের কাছে পাঠানো হয়। ফলে জার্মানী সমেত ঐ সব রাষ্ট্র উহাকে **'চাপিয়ে দেওয়া শর্ত'** বলে মনে করেন।

উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতি ঃ প্যারিসের শান্তি চুক্তি প্রধানতঃ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার মূলকথা ছিল— ন্যায় বিচার, জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, গণতন্ত্র ও জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া, উহা দ্বারা গোপন কূটনীতির অবসান, উপনিবেশগুলোর দাবীর মীমাংসা, অস্ত্র-শস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস ও জাতিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বাধাসমূহ দূর করা



প্রেসিডেণ্ট উইলসন

প্রভৃতি নীতি ঘোষিত হয়। উপকূলের বাইরে মুক্ত সমুদ্রের ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারও উহাতে মেনে নেওয়া হয়।

শান্তি সম্মেলনে **পাঁচটি চুক্তি** হয়। জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মেন, হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়ানন, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউল এবং তুরস্কের সঙ্গে সেভ্‌রের সন্ধি হয়। ঐ সব চুক্তির ফলে ইউরোপের মানচিত্রের নানা পরিবর্তন ঘটে। জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও রাশিয়ার আয়তন হ্রাস পায়। অস্ট্রিয়া থেকে হাঙ্গেরীকে পৃথক করা হয়। বোহেমিয়া ও কিছু অংশ নিয়ে সৃষ্টি হয় চেকোশ্লোভাকিয়া। সার্বিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় যুগোশ্লোভাকিয়া। গ্রীস, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার আয়তন হ্রাস করে ফিনল্যাণ্ড, লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া নামে নতুন রাজ্য গঠন করা হয়। পোলিশ করিডর সৃষ্টি করে জার্মানীকে খণ্ডিত করা হলো। ডানজিগ বন্দরকে জাতি সংঘের অধীনে মুক্ত বন্দর বলে ঘোষণা করা হয়। জার্মানরা উহাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং উহার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

ইউরোপের পুনর্বিন্যাস

ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে প্রচুর লাভের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালির কিছুই লাভ হয়নি। এদিকে যুদ্ধের পর দেশে ধর্মঘট ও নানা অরাজকতা শুরু হয়। শ্রমিকগণ সোভিয়েত গঠন এবং কিছু কিছু শিল্প অধিকার করে। ফলে দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সরকারও ঐ বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ হন। ঐ হতাশার মধ্যে উগ্র-জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। তারা দেশবাসীর হতাশাকে কাজে লাগিয়ে প্যারিস চুক্তির অপমানকে মুছে ফেলতে চায়। ঐ দলের নেতৃত্ব দেন **বেনিটো মুসোলিনী**।

ফ্যাসিস্ট কথাটি 'ফ্যাসেস' শব্দ থেকে এসেছে। ফ্যাসেস্ কথার অর্থ এক গোছা লাঠির সঙ্গে বাঁধা কুঠার। প্রাচীনকালে রোমের শাসনের প্রতীক ছিল ঐ ফ্যাসেস। মুসোলিনীর দল ঐ ফাসেস চিহ্ন ব্যবহার করত বলে তাদের বলা হয় ফ্যাসিস্ট। ১৯১৯ সালে তিনি মিলানে 'ফ্যাসি' ক্লাব গঠন করেন এবং ১৯২০ সালে ঐ পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্যাসিবাদের মূল লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী, কেন্দ্রীভূত একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণ, সব রকমের বিরোধের উচ্ছেদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনের ভিত্তিতে জাতিগত ঐক্য স্থাপন। তাছাড়া, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের

ফ্যাসিস্ট দলের উৎপত্তি

উচ্ছেদ তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী ছিল বলে খুব অল্প সময়ে ঐ দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ঐ দলের কালো পোষাকধারী কর্মীরা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। কিন্তু তবুও ক্ষমতালাভে তারা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে মুসোলিনী শ্রমিক সংগঠন (সিণ্ডিকেট) গঠন করে দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কর্মীদের ক্ষমতা দখলের নির্দেশ দেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তিনি রোম অবরোধ করেন। ১৯২২ সালে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সমস্ত ক্ষমতা 'গ্রাণ্ড ফ্যাসেস্ট কাউন্সিলের' হাতে ন্যস্ত হয় এবং মুসোলিনী ছিলেন উহার সর্বাধিনায়ক ও সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।


মুসোলিনী

মুসোলিনী ১৮৮৩ সালে ইতালির এক কর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী থাকলেও শেষে তিনি সমাজবাদ, উদারনীতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি দমন করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি দলের **'ইল দুচে'** বা সর্বাধিনায়ক উপাধি লাভ করেন।

ক্ষমতায় আসার পর তিনি দেশে জঙ্গীবাদের প্রচার ও ফ্রান্সকে ইতালির প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে চুক্তি করেন ও ভূমধ্যসাগরকে 'ইতালীয় হ্রদে' পরিণত করার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়া ও পরে আলবেনিয়া দখল করেন এবং জাতি সঙ্ঘের সনদকে লঙ্ঘন ও অস্বীকার করেন। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি সাহায্য করেন। অল্পদিনের মধ্যে জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করলে মুসোলিনী যুদ্ধে অংশ নেন ও পরাজিত হন। রোমে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবিরোধী জনতার হাতে তিনি নিহত হন।

নাৎসীদের উৎপত্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। তার রাজ্য ও সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তেত্রিশ শত কোটি ডলার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। চারদিক থেকে পঙ্গু জার্মানী ঐ অপমানজনক সন্ধির শর্ত মানতে বাধ্য হয়। এদিকে যুদ্ধের পর তার অর্থনীতি ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। চারিদিকে দেখা দেয় দারুণ অশান্তি, খাদ্যাভাব ও বেকার সমস্যা। ক্ষতিপূরণ দিতে না পারায় বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম সমৃদ্ধ রাইন এলাকা দখল করে। ফলে সারা জার্মানী হতাশা ও অন্ধকারে ভুগতে থাকে। জার্মান জাতি ভার্সাই সন্ধির ঐ অপমানকর অবস্থা কাটিয়ে আবার স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে।

ভার্সাই সন্ধি ও জার্মানী

নাৎসী পার্টি ঃ তৎকালীন সরকার ঐ সব সমস্যার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়। কিছু সামরিক নেতা ও শ্রমিকগণ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ঐ অবস্থায় দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। সকলেই একটি শক্তিশালী সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ সময় ১৯১৯ সালে হিটলার রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে যে জার্মান শ্রমিক দল গঠন করেন উহা ১৯২০ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল বা নাৎসী দল নামে পরিচিত হয়। জার্মান ভাষায় ঐ শব্দগুলোর আদ্যাক্ষর ছিল NSDAPI। উহা হইতেই Nazi কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।

হিটলার অস্ট্রিয়ার এক গরীব চর্মকারের ঘরে ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সৈন্যদল ও পরে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন এবং দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ঐ সময় তিনি নাৎসী পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রচারের ফলে ঐ পার্টি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ১৯২৩ সালে মিউনিখে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মিউনিখ বিয়ার হলে ঐ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল বলে উহা **'মিউনিখ বিয়ার হল পুৎস্'** নামে পরিচিত। তিনি বন্দী হন। উহার পরেই তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।



হিটলার

মাইনকাম্ফ্ ও নাৎসীবাদের মূলতত্ত্ব ঃ বন্দী অবস্থায় তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'মাইন কাম্ফ্' বা 'আমার সংগ্রাম' রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি বলেন, জার্মান বা টিউটন জাতি সভ্যতার স্রষ্টা ও প্রভুর জাতি। তারা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাকে সে মর্যাদা ফিরে পেতেই হবে। ঐ পথে তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়াকে প্রধান শত্রু হিসেবে বর্ণনা করেন। নাৎসীবাদ একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গীবাদের সম্প্রসারণ প্রচার করে, অন্যদিকে উহা ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী। ইহুদী ও কমিউনিস্ট নিধন নাৎসীদের প্রধান কর্তব্য ছিল। নাৎসীবাদ তাঁর আদর্শে দেশে একনায়কতন্ত্র বা 'ফুহরার' কর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। হিটলার শক্তিশালী তৃতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

'মাইন কাম্ফের' বক্তব্য দেশবাসীর মনকে আকৃষ্ট করে। দলের 'বাদামী শার্ট' ও কালো শার্ট' নামে একটা আধা সামরিক বাহিনী গঠিত হয়। তারা বিরোধীদের খতম করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিটলার হেরে যান। ঐ সময় পার্লামেন্টের ভোটে তাঁর দল বেশী আসন লাভ করে। ফলে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন (১৯৩৩)। পরে নানা কৌশল করে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে তিনি একনায়কতন্ত্রের বিল পাশ করেন এবং নিজেকে 'ডিক্টেটর' বলে ঘোষণা করেন (১৯৩৩)। দেশে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র বাতিল হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিরোধীদের অধিকার খর্ব করা হয় এবং হিটলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।

ক্ষমতা দখল

প্রথম থেকেই তিনি ভার্সাই সন্ধি অমান্য করে রণসজ্জা শুরু করেন ও যুদ্ধের পথ বেছে নেন। তিনি জোরপূর্বক রাইন অঞ্চল দখল করেন। ইতালি ও জাপানের সঙ্গে তাঁর সামরিক চুক্তি হয়। উহা যথাক্রমে রোম বার্লিন অক্ষ ও অ্যান্টি কমিণ্টার্ণ চুক্তি নামে পরিচিত। ইতালির সাহায্যে তিনি স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভার্সাই সন্ধি অমান্য করে তিনি অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন এবং ডানজিগ, পোলিশ করিডর ও পোল্যাণ্ডের প্রতি তিনি দাবী করেন। জার্মানী হারানো সন্মান ফিরে পায়। কিন্তু দেশে চলে ইহুদি ও কমিউনিস্টদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার। গেষ্টাপো নামে গুপ্তচরদের সাহায্যে বিরোধীদের নির্মূল করা হয়। শ্রমিক সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি চালু হয়। তিনি জাতিসংঘ ত্যাগ করেন। কিন্তু ঐসব সত্ত্বেও জার্মানী অসাধারণ জঙ্গীবাদে টগবগ করতে থাকে। এতদিন বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারকে কিছুই বলেনি। কিন্তু ১৯৩৯ সালে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ঘটে। অবশেষে ১৯৪৪ সালে হিটলার আত্মহত্যা করেন। ফলে জার্মানীতে নাৎসীবাদের পতন ঘটে।

জাতি-সংঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংস যাতে আর না ঘটে, সেজন্য প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট উইলসন জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। উহার প্রধান দপ্তর ছিল জেনেভা শহরে। তখন উহার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের পরিবর্তে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। বিভিন্ন চুক্তির মর্যাদা রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে সব সমস্যার মীমাংসা করাও উহার লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা, আক্রমণকারীর নিন্দা করা ও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়।

জাতি সংঘের উদ্দেশ্যকে ঠিকমত সফল করার জন্যে সাধারণ সভা, পরিষদ এবং একটি মহাকরণ গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে উহা প্রভাব বিস্তার করে। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের বিরোধের নিষ্পত্তি করে। জাতি সংঘ সার্বিয়াকে আলবেনিয়া থেকে সৈন্য সরাতে বাধ্য করে। গ্রীস ও ইতালির বিবাদ মীমাংসা করে। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে আর্থিক সাহায্য দেয়। গ্রীস ও বুলগেলিয়ার সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে। এশিয়া মাইনরের গ্রীক উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করে। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড এবং পেরু ও কলম্বিয়ার বিরোধ নিষ্পত্তি করে। আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর শ্রমিকদের উন্নতির চেষ্টা করে। কিন্তু জাতি সংঘের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫) ও কেলগ্ ব্রিয়াঁ চুক্তি (১৯২৫)। লোকার্নো চুতি দ্বারা ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামের সীমানা রক্ষার ভার জাতিসংঘ গ্রহণ করে। জার্মানীকে সদস্যপদ দেওয়া হয়। কেলগ ব্রিয়াঁ চুক্তির ফলে মীমাংসার দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তির উপর আবার জোর দেওয়া হয়।

সাফল্য

ঐ সব সাফল্য সত্ত্বেও জাতিসংঘ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আমেরিকা, জার্মানী ও রাশিয়ার অনুপস্থিতি উহাকে দুর্বল করে। ফ্রান্স, জার্মানী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র প্রতিযোগিতা উহার শক্তি হ্রাস করে। লীগের হাতে কোন সৈন্য না থাকায় উহা কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে নি। কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। এছাড়া ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ, জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল ও হিটলারের নানা রাজ্য দখলের সময় জাতিসংঘ ঠিকমত ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ইতালি উহার সদস্যপদ ত্যাগ করে। ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং মাত্র একুশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

ব্যর্থতা

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১) ‘ চৌদ্দ দফা’ শান্তি নীতি প্রচার করেন (জ্ঞানমূলক)
লর্ড এটলী/দ্যতাল/লয়েড জর্জ/প্রেসিডেণ্ট উইলসন।

২) ফ্যাসিবাদের অন্যতম ফলাফল ছিল (বোধমূলক)
একনায়কতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা/প্রজাতন্ত্র প্রবর্তন/দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ না দেওয়া/মন্ত্রীসভার স্বীকৃতি।

৩) হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর হন (জ্ঞানমূলক)
১৯৩৩/১৯৩৯/১৯৪৭/১৯৪৯ সালে।

৪) জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল (জ্ঞানমূলক)
১০/২১/৩১/৪১ জন

১৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে আবার বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। উহার পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল।

প্যারিস চুক্তি ও ভার্সাই সন্ধি ঃ প্যারিস শান্তি চুক্তির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। ঐ চুক্তিতে জার্মানী, ইতালি ও রাশিয়া কেউ খুশী হতে পারেনি। ইতালি সম্মেলন ছেড়ে চলে যায় এবং বিজয়ী মিত্রপক্ষ জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী বলে ঘোষণা করে। আলোচনায় জার্মানীকে একসঙ্গে বসতে দেওয়া হয় নি। নানাদিক থেকে তাকে চিরদিনের মত ধ্বংস করার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ফলে তারা ঐ সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হলেও উহাকে চাপিয়ে দেওয়া ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক সন্ধি বলে বর্ণনা করে। সুতরাং সে ঐ সন্ধিকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে। রাশিয়ারও আয়তন অনেক হ্রাস পায়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গীবাদের প্রসার ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী ও জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গীবাদের উৎপত্তি হয়। যুদ্ধের পর ইতালি ও জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে উভয় দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঐ লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং হিটলারের নেতৃত্বে ন্যৎসীবাদ ক্ষমতা দখল করে। তারা সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ বিস্তারে মন দেয়। তারা সমস্ত দেশ যুদ্ধের কারখানায় পরিণত করে। হিটলার জার্মানীতে তৃতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হুমকি দেন। মুসোলিনী একইভাবে পুরাতন রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। ফলে সারা ইউরোপ ও আফ্রিকায় যুদ্ধের সূচনা হয়। জাপান চীনের রাজ্য দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা ঃ জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর কিছু কিছু বিরোধের মীমাংসা করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্বার্থ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি ব্যর্থ হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সারা ইউরোপে চালু হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের জন্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। হিটলার, মুসোলিনী ও জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করে। উহার আইন অমান্য করে হিটলার রাইন অঞ্চল,

চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া দখল করে। মুসোলিনী আলবেনিয়া ও আবিসিনিয়া অধিকার করে। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। জাতিসংঘ ঐ সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় যুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়।

গোপন কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য ঃ জাতিসংঘের দুর্বলতায় ইউরোপ ও অন্যত্র নেরাজ্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় জাতিসংঘের সনদকে লঙ্ঘন করে কিংবা গোপন কূটনীতির আশ্রয় নেয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে। ফ্রান্স জামর্নীর ভয়ে ইংল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে। মিত্রপক্ষ রাজী না হওয়ায় স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করে। অন্যদিকে জামর্নী, ইতালি ও জাপান নিজেদের মধ্যে সামরিক চুক্তি করে। ঐসব গোপন কূটনীতির ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্দেহ বাড়তে থাকে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে আসে।

হিটলার একের পর এক ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য গ্রাস করতে থাকেন। মুসোলিনীও ইউরোপ ও আফ্রিকায় একই নীতি অনুসরণ করেন। বিপদ বুঝে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, জামর্নীর বিরুদ্ধে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমন এক সময় ১৯৩৯ সালে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বৃটেন ও ফ্রান্স জামর্নীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়।

যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানবাহিনী প্রচণ্ড গতিতে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে এগিয়ে যায়। ফ্রান্স পরাজিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া ও ইতালিও যুদ্ধে যোগ দেয়। হিটলারের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু হঠাৎ জামর্নীর রাশিয়া আক্রমণ ও জাপানের পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতালি পরাজিত হয়। এদিকে জামর্নী রাশিয়ার হাতে পরাজিত হয় এবং জাপানও আণবিক বোমার আঘাতে কাবু হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪৫ সালে ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ফ্রান্সের জেনারেল দ্যগল ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

ঘটনাবলী

যুদ্ধের ফলাফল ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের ফলে প্রচুর



মিঃ চার্চিল



মিঃ রুজভেল্ট

লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় এবং শিল্প অঞ্চলের দারুণ ক্ষতি হয়। জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমার উপর আণবিক বোমার ক্ষয়-ক্ষতি এখনও আমাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া ও আমেরিকার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, ঐ যুদ্ধের পর কমিউনিজমের বিস্তার ঘটে। রাশিয়ার নেতৃত্বে উহা সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পৃথিবী পুঁজিপতি আমেরিকা ও সমাজবাদী দু-শিবিরে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। চতুর্থতঃ, ঐ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সর্বত্র বিভিন্ন উপনিবেশ ও অধীন রাষ্ট্রসমূহে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু হয় ও বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পঞ্চমতঃ, ধ্বংসের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা ও বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রসংঘ। উহা জাতিসংঘের মত পৃথিবীতে শান্তির তদারক করছে। তাছাড়া, ইউরোপের শিল্প এলাকা একেবারে নষ্ট হবার ফলে আমেরিকা ও জাপান পৃথিবীর বাজার দখল করে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবে অবসান ঘটে?
- বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি?
- আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কে ছিলেন?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- প্যারিস চুক্তি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ কিভাবে যুদ্ধের কারণ হয়? (বোধমূলক)
- জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও গোপন কূটনীতি কিভাবে বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করে? (ঐ)
- ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল? (ঐ)

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (জ্ঞানমূলক)

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে — সালে।
- — — বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট — যুদ্ধে দৃঢ়তা দেখান।

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

- জার্মানীকে কিভাবে গণ্য করা হয় চুক্তিতে? (বোধমূলক)
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু কখন হয়? (জ্ঞানমূলক)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম ফলাফল ছিল (বোধমূলক)
কমিউনিজমের বিস্তার/জার্মানীর নতুন শক্তি লাভ/ইতালীর ক্ষমতা বৃদ্ধি / চার্চিলের নীতির অবমাননা।

১৬

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯১৯-১৯৪৭)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সচিব ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের সাহায্য করে। কিন্তু যুদ্ধের পর ইংরেজ স্বাধীনতা দিতে রাজী না হওয়ায় আরও তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন চেহারা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয়। ফলে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। তিনি গুজরাট রাজ্যের পোরবন্দর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডে আইনপাঠ শেষ করে তিনি দঃ আফ্রিকায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। তিনি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। চাষী ও শ্রমিকদের পক্ষে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালান। ইংরেজদের মুসলিমদের খলিফার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী মুসলিমদের **খেলাফত আন্দোলন** সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার পাশ হয়। ঐ আইনে ইংরেজ ভারতকে স্বরাজ দানের কোন কথাই বলেনি। বরং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উপর জোর দেয়। ফলে দেশে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শোভাযাত্রা ও ধর্মঘট আরম্ভ হয়। কুখ্যাত **রাউলাট আইন পাশ** করে সরকার সমস্ত রকমের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে এবং লোকেদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। পাঞ্জাবে জোর আন্দোলন চলে। নিরস্ত্র জনসাধারণ রাউলাট আইন ও নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৩ই এপ্রিল

মোহনদাস গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

জালিয়ানওয়ালাবাগের একটি বাগানে মিলিত হয়। উহা চারিদিক দিয়ে ঘেরা ছিল। ঐ সময় ব্রিটিশ বাহিনী জেনারেল ডায়ারের আদেশে হঠাৎ গুলিবর্ষণ করতে থাকে। প্রায় এক হাজার লোক মারা যায় এবং দু হাজার আহত হয়। ঐ ঘটনায় সারাদেশ ইংরেজদের ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) ঃ দেশের ঐ দুর্দিনে অপরাধী ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ নীতি গৃহীত হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। ইংরেজদের দেওয়া পদবী ত্যাগ, আইন সভা বর্জন, সরকারী স্কুল ও কলেজ ত্যাগ প্রভৃতির জন্যও তিনি আবেদন জানান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুব্রাহ্মণ্য আয়ার 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। ছাত্ররাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আইনজীবীরা কোর্ট বয়কট করেন। বিদেশী দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলা হয়। সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। নানা দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। আসমুদ্র হিমাচলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার অবস্থার মোকাবিলায় কঠোর ব্যবস্থা নেন। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক বন্দী হয়। এছাড়া, দ্বিতীয় দফায় শুরু হয় খাজনা না দেবার আন্দোলন। **চৌরিচোরা** অঞ্চলের কৃষকগণ হঠাৎ পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে ও কিছু পুলিশকে হত্যা করে। গান্ধীজী অবস্থা খারাপ চিন্তা করে আন্দোলন বন্ধ করার আদেশ দেন।



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর ডাকে কৃষক ও শ্রমিক সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তিনি কুটির শিল্প ও গ্রামের উন্নতি কংগ্রেসের নীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বিহারের চম্পারণ জেলায় নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন ও বন্দী হন। আমেদাবাদের কাপড় শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থে তিনি আন্দোলন করেন। ফলে কৃষক ও শ্রমিক তাঁর ডাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চৌরিচোরা স্থানের কৃষকগণ পুলিশের উপর আক্রমণ করে। এভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন গণসংগ্রামে পরিণত হয়। এদিকে তরুণ **নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ও নেহরু**

কৃষক-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

রাশিয়ার বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেন। রাশিয়া পশ্চিমী পুঁজিপতি দেশগুলোর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিকদের আন্দোলনে উৎসাহ দিতে থাকে। তরুণ নেতারা মনে করতেন, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া আন্দোলনে সফলতা সম্ভব নয়। এদিকে ভারতে শিল্প বিপ্লব ঘটে। এম. এন. যোশীর নেতৃত্বে সারা ভারত **ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস** গঠিত হয়। ঐ সমিতি নিজেদের দাবি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগ দান করে। শিল্পে ধর্মঘট পালিত হয়। শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে কংগ্রেস নেতাগণ তাদের সমর্থনে প্রতিবাদ ও কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সালে সারা **ভারত কিষাণ সভা** গঠিত হয়। উহা জমির উপর অধিকার ও জমিদারী ব্যবস্থার অবসান প্রভৃতি দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করে। কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেস **সমাজতন্ত্রবাদকে লক্ষ্য** হিসেবে মেনে নেয় এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভারত গঠন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, জমির সুষ্ঠু বণ্টন প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেস ভারতকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেয়। ইতিমধ্যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি হয়। ফলে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্যে আন্দোলন আরও প্রবল হয় এবং সবার মিলনে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে।



নেহেরু

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার আদেশ দিলে কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যায়। মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ **স্বরাজ্য পার্টি গঠন** করে আইন সভার মধ্যে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। নেহরু ও সুভাষচন্দ্র আরও জোরদার আন্দোলন চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে ১৯২৯ সালে **লাহোর কংগ্রেস** পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং উহার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস বলে পালন করা হবে ঠিক হয় এবং মহা উৎসাহের সঙ্গে সারা ভারতে ঐদিন পালন করা হয়। এরপর শুরু হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে **আইন অমান্য আন্দোলন**। গুজরাটের বারদৌলি জেলায় গান্ধীজী খাজনা না দেবার আন্দোলন শুরু করা স্থির করেন। শুরু হয় বিখ্যাত **ডাণ্ডি অভিযান** (১৯৩০)। তিনি পায়ে হেঁটে আরব সাগরের তীরে লবণ তৈরি এলাকায় যাত্রা করেন

আইন অমান্য আন্দোলন

এবং লবণ আইন অমান্য করেন। সারা ভারতেও উহার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা দেশেও আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র হয়। হরতাল, শোভাযাত্রা, বিদেশী জিনিস বর্জন ও খাজনা বন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নারী-পুরুষ উহাতে অংশগ্রহণ করে এবং বহু লোক নিহত হয়। গান্ধী, নেহরু সমেত প্রায় ৯,০০০ লোককে সরকার গ্রেপ্তার করে। উত্তর পশ্চিমে **খান আবদুল গাফফার খান** সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠিত **লালকোর্তা বাহিনী** নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। সরকার প্রচণ্ড দমন নীতি চালিয়ে আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হন। ইংরেজ অগত্যা কংগ্রেসকে বৈঠকে আহ্বান করে। লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজির চুক্তি হয়। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও ভারত আইন (১৯৩৫) ঃ ঐ অবস্থায় দেশে হতাশা নেমে আসে। নতুন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাক্-উল্লাহ, রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, বটুকেশ্বর দত্ত, ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তরুণদের মনে স্বাধীনতার স্বপ্নকে তুলে ধরেন। এদিকে সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীগণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করে ঐ আন্দোলনকে নতুন শক্তি দান করেন। তাঁদের অনেকেই ফাঁসিতে জীবন দান করেন। সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৩৫ সালে ভারত আইন পাশ করে। ঐ আইনের নির্বাচনের ভিত্তিতে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে।

ভারত-ছাড় আন্দোলন

ইতিমধ্যে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে নানা গোলটেবিল বৈঠক হয় কিন্তু উহাতে কোন লাভ হয়নি। কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে ইংরেজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের জনবল ও সম্পদ ব্যবহার করতে থাকে। কংগ্রেস জার্মানী ও জাপানের আক্রমণের নিন্দা করলেও ইংরেজ সরকার স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নিল না। বরং আলোচনার জন্যে লর্ড স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠানো হয়। কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থ হয়। এদিকে জাপানী সৈন্য ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করায় দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঐ বছর (১৯৪২) কংগ্রেস **ভারত ছাড় আন্দোলন** প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ভারতবাসীদের ঐ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে ডাক দেয়। নেতাদের বন্দী করা হলো ও কংগ্রেসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি দেশে চরম আকার ধারণ করে। 'কারেঙ্গে ইয়ে মারেঙ্গে' ধ্বনি তুলে জনসাধারণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসন অচল হয়ে যায়। বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার মরিয়া হয়ে ঐ আন্দোলন দমন করে। সারা দেশে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সুভাষচন্দ্র ঃ এদিকে সুভাষচন্দ্র বাইরের শক্তির সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছায় গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। তিনি ছদ্মবেশে আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ঘুরে প্রথমে জার্মানী ও পরে সাবমেরিনে সাগর অতিক্রম করে জাপানে হাজির হন। সেখানে জাপানের সাহায্যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সে সময় জাপানের হাতে বহু ভারতীয় বন্দী ছিল। তাদের সাহায্যে তিনি ও রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। সিঙ্গাপুরে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি 'নেতাজী' উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর ১৯৪৩ সালে তিনি সরকারের প্রধান হিসেবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। মণিপুর, আসাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তিনি স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দেন। সারা দেশ উত্তেজনা ও আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু জাপানের পরাজয় হলে ঐ বাহিনীর পরাজয় ঘটে। নেতাজী শেষে (মতান্তরে) এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান (১৯৪৫)। তিনি ১৮৯৭ সালে উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের অন্যতম। সমাজতন্ত্রের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ও নেহরু কংগ্রেসকে গণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। পরে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। তা সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে **ফরোয়ার্ড ব্লক** নামে বামপন্থী দল গঠন করেন (১৯৩৯)। পরে সরকার তাঁকে গৃহবন্দী করে। ঐ অবস্থায় তিনি ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করেন । আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতা হিসাবে তাঁর সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।



নেতাজী

গণআন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুতরাং যুদ্ধশেষে ভারতীয়গণ ঐ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে। এদিকে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকারের অবহেলায় হাজার হাজার লোক প্রাণ হারায়। অন্যদিকে সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বিচার করে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করে। দিল্লীর লালকেল্লায় বিচার শুরু হয়। উহাতে সারা দেশে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। হরতাল, শোভাযাত্রা প্রভৃতি পুরোদমে চলে। বিচারে শাহনওয়াজ খান, আবিদ

আলি ও কর্নেল ধীলন প্রভৃতি মুক্তি পান। কিন্তু সরকার স্বাধীনতা দান ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি। ফলে যুদ্ধের শেষে জমাট ক্ষোভ বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে। নানা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় **নৌ-সেনা বিদ্রোহ** ঘোষণা করে। কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরেও উহা ছড়িয়ে পড়ে। সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে বৃটেনে শ্রমিক দল সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী লর্ড এট্‌লী ভারতকে স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লর্ড ওয়াভেলের মাধ্যমে ভারতে সংবিধান সভা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৪৬ সালে ভারতের শাসন ব্যাপারে আলোচনার জন্যে তিনি পার্লামেণ্টের তিনজন মন্ত্রীকে নিয়ে **ক্যাবিনেট মিশন** গঠন করেন। লর্ড লরেন্স, স্যার ক্রীপস্ এবং মিঃ আলেকজাণ্ডার ঐ মিশনের সদস্য হিসেবে ভারতে আসেন। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা শুরু হয়। ভারতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। জওহরলালের নেতৃত্বে ঐ সরকার গঠিত হয় (১৯৪৬)। মুসলিম লীগ উহা বর্জন করলেও পরে উহাতে যোগদান করে। ঐ সময় লর্ড এট্‌লী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। এদিকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল হিসেবে এদেশে আসেন (জুন, ১৯৪৭)। তাঁর উপর ভারতীয়দের ক্ষমতা হস্তান্তর করার অধিকারও দেওয়া হয়। তিনি এক ঘোষণায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ এবং পৃথক শ্রীহট্ট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গণভোটের প্রস্তাব দেন।

ক্ষমতায় হস্তান্তর

অবশেষে বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করে। উহার ফলে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হন মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহরু। স্বাধীনতার পর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭)

অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. গান্ধীজী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কখন ঘটে?
৩. অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয়?
৪. কিষাণ সভা কবে স্থাপিত হয়?
৫. ডাণ্ডি অভিযান কবে ঘটেছিল?
৬. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কে আন্দোলন চালনা করেন?
৭. ভারত ছাড় আন্দোলন কবে ঘটে?
৮. আজাদ হিন্দ সরকার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
৯. ক্যাবিনেট মিশন কবে গঠিত হয়?
১০. ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাশ হয়?
১১. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

(জ্ঞানমূলক)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১. রাউলাট আইন কি?
২. ডাণ্ডি অভিযান কি?
৩. ভারত ছাড় আদোলন কবে ঘটে?
৪. ক্যাবিনেট মিশন কাকে বলে?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন কি ভাবে জোরদার হয়? তাঁর অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বর্ণনা কর। (বোধ/জ্ঞানমূলক)
২. স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা লিখ। (প্রয়োগমূলক)
৩. গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড় আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (বোধমূলক)
৪. আজাদ হিন্দ বাহিনী কে, কোথায় ও কেন গঠন করেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উহার প্রভাব ও কৃতিত্ব লিখ। (জ্ঞান-বোধও প্রয়োগমূলক)
৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে গণ আন্দোলন দেখা যায় কেন? কিভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে? (বোধমূলক)

(জ্ঞানমূলক)

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন ———।
২. ——— উপাধি ত্যাগ করেন।
৩. ——— নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়।
৪. খান আব্দুল গফফর খানের বাহিনীকে —— বাহিনী বলা হয়।
৫. ——— ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।
৬. ——— ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

- রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগের চুক্তি ছিল (প্রয়োগমূলক)
- জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্রিটিশ বর্বরতা/গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য/সুভাষ বসুকে নজরবন্দী করা/আজাদহিন্দ বাহিনীর বিচার।
- স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ ছিলেন (জ্ঞানমূলক)
  ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ/ নেহরু/ভগৎ সিং/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭

চীনের ইতিহাস

(ক) চীন প্রজাতন্ত্র

উত্তর চীনের নানকিং-এ ডঃ সান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে, মাঞ্চু সম্রাটকে পদচ্যুত করে ইউয়ান ক্ষমতা দখল করেন। এভাবে চীন দুভাগে ভাগ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ঐ অবস্থায় ডঃ সান ইউ-য়ানকে

বিভক্ত প্রজাতন্ত্র

অখণ্ড চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট বলে মেনে নেন (১৯১২) এবং নিজে প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে ডঃ সানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তিনি জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শাসক হতে চেয়েছিলেন। বিদেশীদের সাহায্যে নিজ ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করে তিনি কুয়োমিণ্টাং দলকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। ডঃ সান বিদেশে আশ্রয় নেন। ইউয়ান জাতীয় পরিষদ বাতিল করেন এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু জাপান বাধা দেয়। শোকগ্রস্ত ইউ-য়ান ১৯১৬ সালে মারা যান।

কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় বিভিন্ন অঞ্চলের সমর নেতাগণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। এদের মধ্যে উত্তর অঞ্চলের ফ্যাং, ইয়াং-সি অঞ্চলের ওউ পেই ফু ও পিকিং অঞ্চলের চ্যাংলিন ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন

চীন তু-চুনদের আধিপত্য

ভীষণ অত্যাচারী। ইউয়ানের মৃত্যুর পর দেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে তারা দু'পক্ষে যোগ দেয়। বড় বড় শক্তিবর্গ চ্যাংলিন ও ওউ পেই ফুকে সাহায্য করে। ফলে চীনে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ডঃ সান যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাদেরকে দমন করতে পারেন নি।

কুয়োমিন্টাং (জাতীয়তাবাদী) দল ঃ ডঃ সান ছাত্রজীবন থেকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি মনে করতেন, দুর্বল সম্রাটের উচ্ছেদ না হলে চীনে প্রজাতন্ত্র গঠন করা যাবে না ও জনসাধারণের মঙ্গল হবে না। জাপানে থাকাকালে তিনি দলকে চীনের বিপ্লবী দল তুং মেং হুই-এর সঙ্গে যুক্ত করেন। তাদের প্রভাবে

সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং ডঃ সানের নেতৃত্বে দঃ চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তাঁর দল দেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে ওঠে। তখন উহা কুয়োমিণ্টাং বা জাতীয়তাবাদী দল নামে পরিচিত হয়।

ডঃ সানের নীতি

চীনের উন্নতির জন্য ডঃ সান যে নীতি ঘোষণা করেন উহা 'ত্রি নীতি' নামে পরিচিত। উহার মূল কথা ছিল ঃ (ক) জাতীয়তাবাদ, (খ) গণতন্ত্র (গ) জীবিকা অর্জনের অধিকার। উহা দ্বারা তিনি জমি ও মূলধনের সমানভাবে বণ্টন, একচেটিয়া কারবার লোপ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া, তিনি চীনে পাশ্চাত্ত্য শক্তির হ্রাস ও সম্রাটের উচ্ছেদ করে জনগণকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী করতে চেয়েছিলেন।

৪ঠা মে, ১৯১৯ আন্দোলন ঃ চীনের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, সামরিক নেতাদের ক্ষমতার লড়াই, প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্রগণ যে আন্দোলন করে তাকে ৪ঠা মের আন্দোলন বলা হয়। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় উহা তীব্র হয়ে উঠে। সকলেই চীনকে ঐ শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্ত করে এক আধুনিক এবং শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং দেশের শান্তি ও সম্মান ফিরে আসে। ভাষা সংস্কার, কুয়োমিণ্টাং দলের পুনর্গঠন, কমিউনিস্ট দলের জন্ম এবং বলশেভিক সরকারের সাহায্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। সরকার উহা দমনের চেষ্টা করেন । ফলে আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়ে। উহার ফলে চীনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

ঐ উদ্দেশ্যে তিনি সমর নেতাদের সাহায্যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিকিং-এ আলোচনার সময় হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। (১৯২৫)।

কুয়োমিণ্টাং কম্যুনিস্ট সম্পর্ক (১৯২১-২৪) ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিরোধী নীতি ও জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস তাকে চীনের বন্ধু করে তোলে। ডঃ সানও কমিউনিস্ট আদর্শে দলকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং দু'দলের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে কমিউনিস্ট দল কুয়োমিণ্টাং দলের মধ্যে উপদল হিসেবে কাজ করতে থাকে। রুশ সাহায্যে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাশিয়ায় ট্রেনিং প্রাপ্ত চিয়াং কাইশেক উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দু'দলের মিলনে কুয়োমিণ্টাং দল আরও শক্তিশালী হয়।

চিয়াং কাইশেক ও মাও সে তুং ঃ ডঃ সানের মৃত্যুর পর প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাইশেক দলের নেতৃত্ব পদ লাভ করেন। ক্যাণ্টনে নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ়

করে তিনি দেশে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সমর নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দু'বছরের মধ্যে তিনি তাদের দমন করেন। পরে তিনি নানকিং-এ রাজধানী পরিবর্তন করেন। অনেক বিদেশী সরকার তাঁর সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ইতিমধ্যে মাও-সে তুং, লি শাও চি, চৌ এন লাই ও তু চের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট আদর্শ কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।


চিয়াং কাইশেক


মাও সে তুং

তাঁরা মধ্য চীনে জোতদার ও পুঁজিপতিদনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। হ্যানকাউ-এ মাও সে তুং-এর কমিউনিস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এদিকে কুয়োমিণ্টাং দলের পুঁজিপতি ও জোতদারগণের চাপে চিয়াং কমিউনিস্টদের দমন করতে মনস্থ করেন। তাঁরা কুয়োমিণ্টাং থেকে বিতাড়িত হয়। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নানাভাবে কমিউনিস্টদের তিনি উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তাঁরাও ইতিমধ্যে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের নিয়ে লালবাহিনী গড়ে তোলেন এবং হুনান এবং কিয়াংসি এলাকা দখল করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। নানা ধরনের জনকল্যাণকর নীতির ফলে কমিউনিস্ট সরকার সাধারণ মানুষের সহানুভূতি লাভ করে। শেষে চিয়াং তাদের শেষ শিক্ষা দেবার মনস্থ করেন। তাঁদের ঘাঁটি অবরোধ করেন। সমস্ত সরবরাহ তিনি বন্ধ করে দেন। সরাসরি বাধা দান অসম্ভব বুঝে কমিউনিস্টগণ সপরিবারে সেনসি প্রদেশ থেকে ৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে চীনের উত্তর-পশ্চিম দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলে উপস্থিত হন। ইতিহাসে উহা **'দীর্ঘ পরিক্রমা'** নামে পরিচিত (১৯৩৪)। সেখানে মাও সরকার গঠন করেন ও চীনের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৩১ সালে জাপান চীনের এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে। কমিউনিস্টগণ প্রবলভাবে জাপানকে আক্রমণ করে এবং চিয়াংকে মিলিতভাবে আক্রমণের জন্য চাপ দেয়। চিয়াং রাজী না হওয়ায় কমিউনিস্টগণ তাকে সিয়াং-ফু নামক স্থানে

বন্দী করে (১৯৩৬)। যৌথ আক্রমণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সর্বত্র কমিউনিস্টগণ জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) শুরু হয়। চীন মিত্রপক্ষের সাহায্যে জাপানকে পরাজিত করে।

মূল ভূখণ্ডে মাও-এর কর্তৃত্ব স্থাপন (১৯৪৯) ঃ জাপানের পরাজয় নিশ্চিত হলে দু'দলের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়। দু'পক্ষই নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এদিকে চিয়াং-এর দমন নীতির ফলে কমিউনিস্টগণ জনসমর্থন লাভ করে। দু'দলে গৃহযুদ্ধ বাধে। মাঞ্চুরিয়া কমিউনিস্টরা দখল করে। আমেরিকার সাহায্যে চিয়াং ঐ অঞ্চল আক্রমণ করেন। অপর দিকে কমিউনিস্টগণ রাশিয়ার সমর্থনে ঐ আক্রমণের মোকাবিলা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে ঐ গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গেরিলা যুদ্ধনীতি চিয়াং-এ বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলে। কমিউনিস্টদের জয় নিশ্চিত হয়। বিদ্যুৎ গতিতে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্র তাদের অধিকারে আসে। মাও-এর বাহিনীর চাপে চিয়াং ও তাঁর দলবল মূল ভূখণ্ড থেকে ফরমোজা দ্বীপে পালিয়ে যান। এভাবে সমগ্র চীনে মাও-এর শাসন কায়েম হয়। ১৯৪৯ সালে দেশে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক. সানের 'ত্রি-নীতি' কি?
খ. দীর্ঘ পরিক্রমা কাকে বলে?
গ. সিয়াং-ফু ঘটনা কি?

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক. চীনে কমিউনিস্ট পার্টি কবে গঠিত হয়? (জ্ঞানমূলক)
খ. সিয়াং-ফু কত সালে ঘটে?
গ. চনে কমিউনিস্ট সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ক. ইউ-য়ানের কার্যকলাপ ও সমর নেতাদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (বোধমূলক)
খ. কুয়োমিণ্টাং দল কিভাবে গঠিত হয়? উহার সঙ্গে কমিউনিস্টদের কেমন সম্পর্ক ছিল? উহার ফল কি হয়? (বোধমূলক / জ্ঞানমূলকবোধ)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) কমুউনিস্ট চীনের নায়ক ছিলেন— (জ্ঞানমূলক)
হিটলার / বিসমার্ক / মাও সে তুং / সোয়েকর্ণ।

খ) অখণ্ড ভিয়েতনাম গঠন করেন (জ্ঞানমূলক)
মাও সে তুং/ হো চি মিন/ট্রট্স্কি/মুসোলিনী।

গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়
১৯৩৯/১৯৪৫/১৯৪৯/১৯৩০ সালে

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- আটলান্টিক সনদের অন্যতম নেতা কে ছিলেন?
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

- আটলান্টিক সনদের শর্তগুলি কি কি?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

- জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্যগুলি লিখ। (জ্ঞানমূলক)

(খ) ১৯৪৫ সালের পর দঃ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব

ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলকে একত্রে দঃ পূঃ এশিয়া বলা হয়। ঐ সব অঞ্চল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির অধীন ছিল। কিন্তু উহার পূর্বে ও পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হলে, বিভিন্ন শক্তি ঐ সব দেশকে স্বাধীনতা দান করতে বাধ্য হয়।

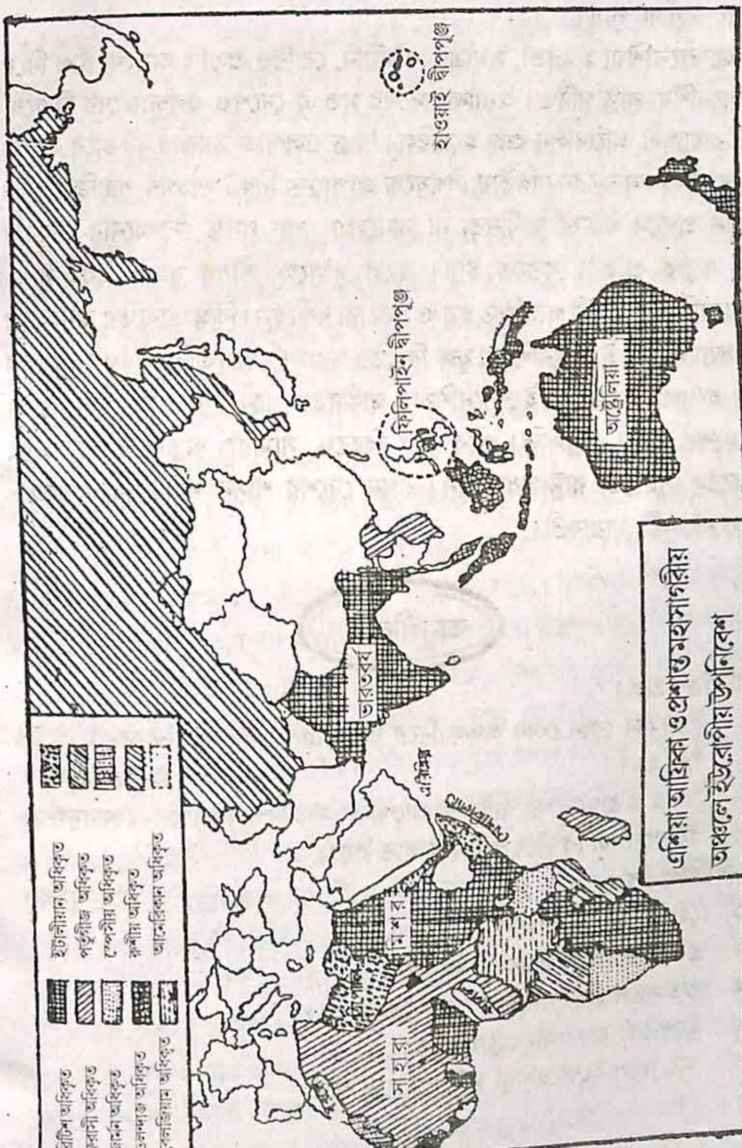
ইন্দোচীন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইন্দোচীন ফরাসীদের অধীন ছিল। বর্তমানের লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম নিয়ে ইন্দোচীন গঠিত ছিল। ফরাসী ও চীনের বিপ্লব, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাহায্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ঐ অঞ্চল দখল করে। জাপান সম্রাট বাওদাইয়ের অধীনে ভিয়েতনাম রাজ্য গঠন করে। কিন্তু বামপন্থী **হো চি মিনের** নেতৃত্বে ভিয়েতমিন লীগ দক্ষিণপন্থী বাওদাইকে সিংহাসনচ্যুত করে ভিয়েতনামে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। হো চি মিন ও তাঁর সমর্থকগণ প্রবল আন্দোলন চালান। ফলে ফ্রান্স ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিতে বাধ্য হয় (১৯৪৬)। ইতিমধ্যে চীনে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ঐ অঞ্চল যেন কমিউনিস্টদের অধীন না হয় সেজন্য আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি চেষ্টা করতে থাকে। ফলে ফরাসীদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধে। শেষে ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনাম দু'ভাগে বিভক্ত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সম্রাট বাও দাই ও উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। পরে ভিয়েতনামে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দঃ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের অধীনে আসে এবং বর্তমানের অখণ্ড **ভিয়েতনাম** রাজ্য গঠিত হয়। বর্তমানে লাওস বাদে অন্যান্য অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রহ্মদেশ

১৯৩৭ সালে বৃটিশ সরকার **ব্রহ্মদেশকে** ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেয়। কিন্তু বর্মীগণ উহাতে খুশী ছিল না। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারা জাপানকে সাহায্য করে। কিন্তু জাপানের খারাপ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে জাতীয়তাবাদীগণ মিত্র পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধের পর বৃটিশ নিজেদের অবস্থা অসহায় ভেবে বর্মীদের সংবিধান রচনার ভার দেয়। ঐ গণ-পরিষদের ঘোষণা অনুসারে বৃটেন উহাকে স্বাধীনতা দান করে (১৯৪৮)। স্বাধীনতা লাভের পর প্রধান মন্ত্রী উনু কমিউনিস্ট ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিছুদিন পর সামরিক অভ্যুত্থানে উনু সরকার পদচ্যুত হন ও নে উইন ঐ দেশের ক্ষমতা দখল করেন। বর্তমানে ব্রহ্মদেশ

'মায়নমার' নামে পরিচিত।

মালয়েশিয়া ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐ দেশের আর্থিক অবস্থা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাপান ঐ অঞ্চল দখল করে। কিন্তু তাদের ব্যবহারে নেতৃবৃন্দ অতিষ্ঠ হয়ে



উঠে। যুদ্ধের পর বৃটিশ তাদের স্বায়ত্ত শাসন অধিকার দানে রাজী হয়। কিন্তু উহাতে প্রবল আপত্তি দেখা দিলে বৃটিশ সরকার মালয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। বৃটেন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মালয়কে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে (১৮৫৭)। সিঙ্গাপুর আরও দু'বছর পরে পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়।

ইন্দোনেশিয়া ঃ জাভা, সুমাত্রা, নিউগিনি, বোর্ণিও প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠিত। অন্যান্য দেশের মত ঐ দেশেও ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার দৃঢ়ভাবে ঐ সব আন্দোলন দমন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নিকট ডাচগণ পরাজিত হয়। জাপান প্রথমে তাদের স্বাধীনতা না মানলেও শেষ পর্যন্ত সোকার্নোর নেতৃত্বে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে দু'পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার বাহিনী পরাজিত হয় ও নেতারা বন্দী হন। কিন্তু ভারতের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ বিরতির পরামর্শ দেয়। এদিকে বিশ্ব জনমতের চাপে হল্যাণ্ড ঐ বছরেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়। সোকার্নো হলেন ঐ দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। পরে তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং জেনারেল সুহার্তো রাষ্ট্র-প্রধান হন। এখন দেশের শাসন পরিচালনা করছেন-সোকার্নো পুত্রী মায়াবতী।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. ইন্দোচীন কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? কিভাবে ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান-বোধমূলক)

২. মালয় ও ব্রাহ্মদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (জ্ঞানমূলক)

৩. ইন্দোনেশিয়া কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করে?

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (জ্ঞানমূলক)

১. হো চি মিন কে ছিলেন?

২. ব্রহ্মদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

৩. কত সালে ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়?

৪. ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

৫. কত সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে?

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষ প্রসার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জাতীয়তাবাদ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতি গৃহীত হয়। উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদিগণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাতে থাকেন। পশ্চিমী দেশগুলোর শোষণ ও পরাধীনতা তাঁদের মনে ক্রমাগত অসন্তোষের সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন এবং আফ্রিকায় মিশর, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, সুদান ও লিবিয়া প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দেয়। এশিয়ায় ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র মুক্তির জন্যে সংগ্রাম শুরু করে। জাতীয়তাবাদের আদর্শে দেশপ্রেমিকগণ স্বাধীনতা দাবী করে। রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমালোচনা ও পরাধীন দেশগুলোর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ঐ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো বৃটেন ও ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্য হিসেবে শাসিত হোত। উহারা ঐ অঞ্চলকে বিভক্ত করে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করে। ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উহারা স্বাধীনতা পায়। অন্যদিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ইতালি লিবিয়ার, ফ্রান্স, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে। মিশরে প্রচণ্ড আন্দোলন চলে। সুদানেও বিক্ষোভ চলে। ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে নিজ মাতৃভূমি গঠনে আন্দোলন চালায়। আরব রাষ্ট্রগণ উহার বিরোধিতা করলেও ইহুদিদের দাবি স্বীকৃত হয়। ফলে আরবদের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যত্রও আন্দোলন জোরদার হলে তাদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়।

আটলাণ্টিক সনদ (১৯৪১) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের ত্রুটিগুলো দূর করে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলাণ্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ঐ চুক্তিকে আটলাণ্টিক সনদ বলা যায়। ঐ সনদে আটটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয় ঃ (১) সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, (২) বলপ্রয়োগে অপরের রাজ্য জয় নীতি বর্জন, (৩) সমুদ্রে সকলের যাতায়াতের সুযোগদান, (৪) সকল দেশকে অভাব থেকে মুক্তিদান, (৫) আর্থিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সমান সুযোগ ও শ্রমিক মান উন্নয়ন, (৬) জনসাধারণের যে কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আঞ্চলিক পরিবর্তন না করা ইত্যাদি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (১৯৪৫) ঃ আটলান্টিক সনদে বর্ণিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। প্রথম বছর ২৬টি দেশ উহাতে স্বাক্ষর

করে। ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনে উহার সনদ রচিত হয়। ঐ বছর উহার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান পৃথিবীর ১৯৩টি দেশ ইহার সদস্য।

উদ্দেশ্য ঃ জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হোল—(১) পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, (২) যুদ্ধের পরিবর্তে আপস মীমাংসা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যাবলী সমাধান (প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক হস্তক্ষেপও করতে পারে)। (৩) বিশ্বের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন। (৪) সমান অধিকার ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা ; এবং (৫) মানব অধিকার, তার মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে সম্মান প্রদর্শন। এ উদ্দেশ্যে ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে একই মর্যাদা দেওয়া হয়। ঐ উদ্দেশ্যে পূরণে উহার ৬টি শাখা আছে—(১) সাধারণ পরিষদ, (২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৩) অছি পরিষদ (যে সব দেশ শাসনের অধিকার অর্জন করে নাই তার তত্ত্বাবধান করা), (৪) আন্তর্জাতিক আদালত, (৫) নিরাপত্তা পরিষদ ও (৬) সদর দপ্তর। আমেরিকার নিউইয়র্কের মানহাট্টা দ্বীপে 'স্টেট এম্পায়ার' নামে এক বিশাল বাড়ীতে জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর অবস্থিত।

সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রসার ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েট রাশিয়া নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে দেশকে দ্রুত শক্তিশালী করে তোলে এবং পৃথিবীর সমাজতন্ত্র আদর্শের প্রসারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলোর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ঐ সব রাষ্ট্র ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু ধীরে ধীরে ইউরোপ ও অন্য মহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন জোরদার হয়। ইউরোপের মধ্যে পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ার কর্তৃত্বে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইতালি, ফ্রান্স ও বৃটেনেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এশিয়া, আফ্রিকা ও দঃ আমেরিকায় সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি স্থানে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমাজতন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবী এখন সমাজতন্ত্র শিবির ও ধনতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শোষণ ও ঔপনিবেশিক অত্যাচার থেকে মুক্তির কথা ঘোষণা করে। ঐ সব রাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে যদিও বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় নেই।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১. পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়বাদ প্রসারের কারণ কি? (জ্ঞানমূলক)

২. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তিনটি উদ্দেশ্যে কি ছিল? (ঐ)

৩. সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার কিভাবে ঘটে? (বোধমূলক)

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. আটলান্টিক সনদ —— রচিত হয়।

২. ঐ সনদে —— নীতি ছিল।

৩. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ —— সালে গৃহীত হয়।

৪. বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ——।

৫. —— ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। (জ্ঞানমূলক)